
রজনী
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

রজনী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৭৭

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
অগ্রহায়ণ ১৪০৮ নভেম্বর ২০০১

প্রথম সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৪১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১



প্রকাশক
মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

প্রচ্ছদের আলোকচিত্র : এ. আর. চৌধুরী

মূল্য
পঁচাশি টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0176-x

ভূমিকা

রজনী (১৮৮৫) বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) একটি ব্যতিক্রমধর্মী উপন্যাস। বিষয়বস্তু, গঠনপ্রণালি, চরিত্রায়ণ ইত্যাদি নানা দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলোর মধ্যে শুধু নয়, সমগ্র বাংলা উপন্যাসে *রজনী*র স্থান অনন্য।

উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা আছে তাঁরা জানেন যে, আত্মসচেতন ব্যক্তিচরিত্রের নানা টানাপোড়েনই হচ্ছে বিশ শতকী আধুনিক উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ। এ-দিক থেকে বিবেচনা করে অনেকেই *চোখের বালি* (১৯০৩) উপন্যাসের সুবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (১৯৬১-১৯৪১) বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতম স্রষ্টা বলে উল্লেখ করেন। তাঁদের এই পর্যবেক্ষণ যথার্থ হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের *রজনী* উপন্যাসেই কিন্তু পাঠক হিশেবে আমরা প্রথম আত্মসচেতন বাঙালি চরিত্রের সন্ধান পাই। এমনকি বিশ শতকী বিশ্বউপন্যাসে মনস্তত্ত্বনির্ভর দ্বান্দ্বিক চরিত্রের যে প্রাধান্য ঘটেছে, *রজনী* সেই লক্ষণটিও ধারণ করে আছে। এ-সব বিবেচনা করে এ-কথা বলা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে, বঙ্কিমচন্দ্রই হচ্ছেন প্রথম বাঙালি ঔপন্যাসিক যাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে বিশ শতকের প্রায় সমস্ত আধুনিক লক্ষণ মোটা দাগে অথবা অস্ফুট রেখায় কোনো না কোনোভাবে ফুটে উঠেছে। উল্লিখিত কারণেই *রজনী* বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ব্যতিক্রমী অথচ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হিশেবে গণ্য হতে পারে। সেই সঙ্গে ঔপন্যাসিক হিশেবে বঙ্কিমচন্দ্র যে বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, সেই তথ্যও বাঙালি পাঠক জেনে যান সহজেই।

চব্বিশ পরগনার কাঁটালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। তাঁর তৃতীয় পুত্র মেধাবী ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেখড়ি হয় পাঁচ বছর বয়সে। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাশ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে যোগ দেন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএল পাশ করেন। তাঁর কর্মজীবন তেইশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র দু-বার বিয়ে করেন : দশ বছরের বিবাহিত জীবন কাটানোর পর ১৮৫৯ সালে প্রথম স্ত্রী মোহিনী দেবীর মৃত্যু হলে ১৯৬০ সালে বিয়ে করেন রাজলক্ষ্মী দেবীকে। নিজের সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে চাকরি নয়, আত্মপ্রচেষ্টা আর এই দ্বিতীয় স্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই উল্লেখ করেছেন এভাবে : 'আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। চাকরি আমার জীবনে অভিশাপ

আর স্ত্রীই আমার জীবনের কল্যাণ-স্বরূপা।' বঙ্কিমচন্দ্রের পুত্রসন্তান হয়নি। তিন মেয়ে : শরৎকুমারী, নীলাজকুমারী ও উৎপলকুমারী। চাকরিজীবনকে বঙ্কিমচন্দ্র অভিশাপ বলেছিলেন হয়তো এ জন্যে যে, ঔপনিবেশিক ইংরেজের অধীনে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। চাকরিই হয়তো তাঁর লেখায় বিঘ্ন ঘটাত।

প্রকৃতপক্ষে আঠারো শতকের ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ততদিনে এ দেশে তাদের বাণিজ্যপুঁজির জাল সম্পূর্ণ বিস্তার করে ফেলেছে। কলকাতাকে কেন্দ্র করে ঘটতে শুরু করেছে নগরায়নের বিকাশ। সৃষ্টি হচ্ছে ভদ্রলোক বা বাবুশ্রেণী। মার্কসবর্ণিত এশিয়াটিক সোসাইটির অনড়-অচল সনাতন গ্রামগুচ্ছ ভেঙে ভারতে ঠিক তখনই উন্মেষ ঘটতে থাকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত প্রখর আত্মসচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। উপনিবেশের সঙ্গে সহযোগিতা করা প্রয়োজন, না বিরোধিতা—ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্বের এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে দেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ হন তাঁরা। তাঁদের হাত ধরেই আধুনিকতার দিকে যাত্রা শুরু করে ভারত। ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলমুক্তির প্রাথমিক অগ্রযাত্রায় সেদিন যিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। ইতিহাসের সেই ক্রান্তিলগ্নে ইউরোপীয় আলোকপর্বের দ্বারা বিভাবিত বঙ্কিম ভারতীয়দের মধ্যে একদিকে মানবতাবোধ এবং অন্যদিকে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের ধারণা সঞ্চারিত করে দেন। উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে এই সাফল্য অর্জন করেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম সচেতনভাবে পাশ্চাত্যের উপন্যাসরীতিকে গ্রহণ করে বাংলা ভাষায় উপন্যাস রচনা করেন। নগরজীবনের বিকাশের ফলে উপন্যাস রচনার পটভূমি অবশ্য আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) *নববাবুবিলাস* (১৮২৫), প্যারিচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-৮৩) *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৭) ও কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-৭০) *হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার* (১৮৬২) মধ্যে নাগরিক জীবনের টুকরো টুকরো ছবি পাওয়া গেল। কিন্তু এধরনের নক্‌শাজাতীয় রচনার মাধ্যমে নতুন কালের বাঙালি পাঠকের কাহিনী আস্বাদনের পিপাসা মিটলো না। বঙ্কিমচন্দ্রের *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই অভাব ঘুঁচে গেল। কাহিনীরসপিপাসু বাঙালি মধ্যবিত্ত পাঠক রোমান্সের মধ্যে নিজেদের আত্মরূপ দেখতে পেলেন। পূর্ণাঙ্গ কাহিনীরস পরিবেশনের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে তাই আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই আবির্ভাবকে রবীন্দ্রনাথ চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন :

> বঙ্কিমচন্দ্র আনলেন সাতসমুদ্র পারের রাজকুমারকে আমাদের সাহিত্য-রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে। তিনি যেমনি *ঠেকালেন* সোনার *কাঠি*, অমনি সেই বিজয়-বসন্ত, লয়লা-মজনুর হাতির দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্যা নড়ে উঠলেন। চলতিকালের সঙ্গে মালাবদল হয়ে গেল, তারপর থেকে তাঁকে আর *ঠেকিয়ে* রাখে কে?

সত্যিকার অর্থেই বঙ্কিমজীবনের পরবর্তী ইতিহাস এক অপ্রতিহত রাজসিক অগ্রযাত্রার ইতিহাস। তেইশ বছর (১৮৬৫-১৮৮৭) স্থায়ী সৃষ্টিশীল জীবনে তিনি একে একে রচনা করেন ১৪টি উপন্যাস : *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫), *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *মৃণালিনী* (১৮৬৯), *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩), *ইন্দিরা* ((১৮৭৩), *যুগলাঙ্গুরীয়* (১৮৭৪), *চন্দ্রশেখর* (১৮৭৫), *রজনী* (১৮৭৭), *রাধারাণী* (১৮৮৬), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮), *রাজসিংহ* (১৮৮২), *আনন্দমঠ* (১৮৮২), *দেবী চৌধুরাণী* (১৮৮৪) এবং *সীতারাম* (১৮৮৭)। এ-সব উপন্যাস ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র আরও লিখেছেন সাহিত্য, ভাষা, সমাজ, ইতিহাস, ধর্মীয় ভাবনাপ্রধান কিংবা বিচারবিশ্লেষণমূলক তীক্ষ্ণ লঘু গদ্য, বিজ্ঞানধর্মী নিবন্ধ ইত্যাদি। এখানে অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলায় উপন্যাস রচনার পূর্বপ্রস্তুতি হিশেবে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজিতে *Rajmohan's Wife* (১৮৬৪) নামে একটা উপন্যাস লিখেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-৫৯) 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' তাঁর বেশকিছু গদ্য-পদ্য প্রকাশিত হয়।

তবে তথ্য হিশেবে যে ঘটনাটি আরও চমকপ্রদ তা হলো, বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সঞ্জীবনীর মতো কাজ করেছে। এই উপন্যাসের মাধ্যমেই ভারতীয়রা, বিশেষ করে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণী পেয়েছে দেশব্রতের দীক্ষা। এ জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্রকে শুধু লেখক নয়, মুক্তস্বাধীন ভারতদ্রষ্টা কিংবা হিন্দুরাষ্ট্রবাদের প্রবক্তা বলে উল্লেখ করা হয়। আর এভাবেই বাঙালির মানসরাজ্যকে সামগ্রিক অর্থেই জয় করেছিলেন তিনি। বাঙালির রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল বিকাশের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম তাই ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে, কাল থেকে কালান্তরে যা প্রবহমান থেকেছে। পরম্পরিত এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেই সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো এই মন্তব্যটি করতে পেরেছেন :

> শেক্‌স্‌পীয়রের ক্ষেত্রে যেমন ভাষ্যের বৈচিত্র্যের পিছনে আছে ইউরোপীয় বাস্তবতা ও ভাবনাজগতের নানা প্রণোদনা, বঙ্কিমের ক্ষেত্রে তেমন আছে বাঙালি মধ্যবিত্তের সঙ্কুল আত্মবীক্ষণের নানা আলোছায়া।...বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ে বাঙালি মধ্যবিত্তের চলিষ্ণু ভাবনার নানা স্তর অনেকটা সেই মধ্যবিত্তের নিজেরই শতাব্দীব্যাপী ইতিহাসের স্তরান্বিত হিসাবনিকাশ।

২

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস প্রধানত পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত : (১) ঐতিহাসিক : *দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী* ও *রাজসিংহ;* (২) ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত পারিবারিক রোমান্স : *কপালকুণ্ডলা* ও *চন্দ্রশেখর;* (৩) বিশুদ্ধ পারিবারিক : *বিষবৃক্ষ, রজনী* ও *কৃষ্ণকান্তের উইল;* (৪) ধর্মতাত্ত্বিক : *আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী* ও *সীতারাম;* (৫) ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত : *ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়* ও *রাধারানী*। লক্ষণীয়, উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগ অনুসারে *রজনী* একটি বিশুদ্ধ পারিবারিক উপন্যাস।

বিবাহিত স্ত্রী ও প্রেমিকার প্রতি আকর্ষণের টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন *বিষবৃক্ষ* ও *কৃষ্ণকান্তের উইল*। কিন্তু এ-দুটি উপন্যাসের মাঝে লেখা *রজনী*র গঠনশৈলী ও বিষয়বস্তু ভিন্ন। রজনী-শচীন্দ্রনাথ এবং লবঙ্গলতা-অমরনাথের প্রণয় কাহিনী গড়ে তুলেছে *রজনী*র গল্পের কাঠামো। এর একদিকে রয়েছে পরিবার অনুমোদিত প্রেম, অন্যদিকে আপাত অস্বীকৃতির নেপথ্যে নারীর অন্তরে প্রবহমান গভীর প্রেম। রজনী ও লবঙ্গলতা চরিত্রের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমের এই দুই রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে, ১৮৭৩-৭৮ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে-সব উপন্যাস লিখছিলেন, তার কাহিনীতে স্থান পাচ্ছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গড়ে ওঠা বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা। বিশেষ করে নতুন কালের নারীর মনের বিচিত্র রূপটি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

*রজনী*র প্রধান ঘটনা শচীন্দ্রনাথের প্রতি অন্ধ সুন্দরী রজনীর প্রেম— শচীন্দ্রনাথের স্পর্শে যার উন্মেষ ঘটে। পরে বিয়ে হয় দু-জনের। এ উপন্যাসে আরও একটি প্রেমের ঘটনা স্থান পেয়েছে—লবঙ্গলতা ও অমরনাথের। লবঙ্গলতা বৃদ্ধ রামসদয় মিত্রের সুন্দরী দ্বিতীয় স্ত্রী। রামসদয়ের প্রথম পক্ষের পুত্র শচীন্দ্রনাথ। রামসদয়ের সঙ্গে বিয়ের আগে অমরনাথ ছিল কিশোরী লবঙ্গলতার রূপমুগ্ধ। লবঙ্গলতার সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়। হয়তো অমরনাথ সম্পর্কে লবঙ্গলতার হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় অনুরাগের। কিন্তু অমরনাথ একরাতে লবঙ্গলতার ঘরে প্রবেশ করলে লোহার তপ্ত শলাকা দিয়ে তার পিঠে 'চোর' লিখে দেয়া হয়। অমরনাথের পরিবর্তে লবঙ্গলতার বিয়ে হয় রামসদয়ের সঙ্গে। রজনীর মাধ্যমে অনেকদিন পর আবার দেখা হয় দু-জনের। কিন্তু ইতিমধ্যে কিশোরী থেকে তরুণীতে উত্তীর্ণ লবঙ্গলতা অনেকটাই বদলে গেছে। তার চরিত্রে পূর্বের ঝাঁজ নেই, প্রাখর্য্য নেই। প্রকাশ্যে সে অমরনাথের প্রেমকে অগ্রাহ্য করলেও অন্তর্লোকে ঠিকই তাকে স্থান দিয়েছে।

৩

রজনী ১২৮১-৮২ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এর দু-বছর পর ১২৮৪ (১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে) সনে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় *রজনী*র প্রকাশিত হয়েছিল আরও দুটি সংস্করণ। উপন্যাসটির 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, লিটনের *Last Days of Pompeii* উপন্যাসের অন্ধ ফুলওয়ালী নিদিয়াকে অবলম্বন করে তিনি রজনী চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন। আর চরিত্রের জবানিতে কাহিনী বর্ণনার রীতি তিনি গ্রহণ করেছেন উইলকি কলিন্সের *Woman in White* নামক গ্রন্থ থেকে।

এই অনুসৃতি সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, চরিত্রচিত্রণ ও গঠনশৈলীর দিক থেকে বাংলা উপন্যাসে *রজনী*র অভিনবত্ব অনস্বীকার্য। দুটি নারী ও দুটি পুরুষ চরিত্র—রজনী, লবঙ্গলতা, শচীন্দ্রনাথ ও অমরনাথ নিজেরাই উপন্যাসের কাহিনী

বর্ণনা করেছে। একজনের বর্ণনা শেষ হলে শুরু হয়েছে অন্যজনের বর্ণনা। এইভাবে রক্ষা করা হয়েছে কাহিনীর পারম্পর্য। চরিত্রগুলো যাতে তাদের হৃদয়ের কথা ঠিক ঠিক বলতে পারে সে জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ অবলম্বন না করে চরিত্রগুলোকে কাহিনী বর্ণনার ভার দিয়েছেন। অন্ধ রজনীর অন্তর-অনুভূতি কিংবা লবঙ্গলতার মনের গহনে লুকিয়ে থাকা দুঃখ, দ্বন্দ্বমূলক প্রেমভাব অথবা অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত অমরনাথের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের কথা এই রীতি ছাড়া হয়তো যথাযথভাবে বর্ণনা করা যেত না। কেননা চরিত্র যখন আত্মকথনরীতি গ্রহণ করে, তখন সেই কথনের মধ্য দিয়ে তার আত্মউন্মোচন ঘটে থাকে।

*রজনী*তে তাই বাইরের ঘটনা প্রাধান্য লাভ করেনি। রজনীর শ্রবণজ পূর্বরাগ কিংবা স্পর্শজনিত শারীরিক অনুভূতিকে তুলে ধরেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। অতীতের অমরনাথ আশ্রয় নিয়েছে লবঙ্গলতার মগ্নচৈতন্যে। আর উপন্যাসের শেষে রজনীর জন্যে শচীন্দ্রনাথের যে তন্ময় অবস্থা—এ-সব ঘটনার কোনোটিই বাইরের ঘটনা নয়। ব্যক্তির মানসিক অবস্থাকেই তা ফুটিয়ে তুলেছে। রজনী, লবঙ্গলতা, অমরনাথ ও শচীন্দ্রনাথ—এই চরিত্র চতুষ্টয়ের মানস-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা বিস্ময়কর। আর এভাবেই মানবচিত্তের গভীরে প্রবেশ করে বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেন প্রথম বাংলা মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস *রজনী*। দেবীপদ ভট্টাচার্য তাই যথার্থই বলেছেন যে, 'রজনী উপন্যাসখানির প্রধান বৈশিষ্ট্য তার নতুন টেকনিক'। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ঘরে বাইরে* (১৯১৬), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) *স্বামী* (১৯১৮), সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-৬৫) *জাগরী*তে (১৯৪৬) দেখা যাবে চরিত্রের এই স্বকথনরীতির বিচিত্র প্রয়োগ।

তবে লক্ষণীয়, শুধু বর্ণনাকৌশল নয়, আর একটি কারণে *রজনী* বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। এই লেখার শুরুতেই আমরা বলেছি যে, আত্মসচেতনতাই আধুনিক উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ। লবঙ্গলতার চরিত্রের মধ্যে আমরা এই আত্মবোধের প্রথম স্ফুরণ লক্ষ করি।

প্রকৃতপক্ষে লবঙ্গলতাকেই বলা যায় বিনোদিনী (*ঘরে বাইরে*), পার্বতী (*দেবদাস*) কিংবা কুসুমের (*পুতুল নাচের ইতিকথা*) পূর্বসূরি। লবঙ্গলতাই *রজনী*র প্রধান আকর্ষণ। রামসদয় মিত্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লবঙ্গলতা 'মানের মানিনী, গৌরবের গরবিনী'। প্রখর বুদ্ধিমতি, সদাকৌতুকপ্রিয়, কর্তব্যপরায়ণ লবঙ্গ সমগ্র *রজনী*তে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কোমলে-কাঠিন্যে তার চরিত্রের আদলটি গড়া। কিন্তু আপাত সার্থক সাংসারিক জীবনের বাইরে অমরনাথকে ঘিরে তার রোদনভরা বসন্তের দিনগুলি যে ব্যর্থতায় অভিব্যক্ত, আশ্চর্য সহানুভূতির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তা চিত্রিত করেছেন। মাত্র একটি আত্মকথনে প্রকাশ পেয়েছে তার হৃদয়ের যত কথা : 'কাণি। তুই ভালবাসার কি জানিস। তুমি লবঙ্গলতা অপেক্ষা অনেক সুখী।'

প্রেম-অপ্রেম—লবঙ্গলতা চরিত্রটির মধ্যে সবসময় এরকম একটা দ্বৈতরূপ লক্ষ করি আমরা। কর্মে নিপুণা লবঙ্গের সংসারজ্ঞান অতুলনীয়। এ কারণেই রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের প্রণয়স্থাপন ও বিয়ের ব্যাপারে তাকে তৎপর দেখা যায়। সুন্দরী লাস্যময়ী এই রমণী একসময় তার হার্দ্রিক দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেললেও পরমুহূর্তে সেই দুর্বলতাকে সহজেই জয় করে নিয়েছে। অমরনাথ যতদিন চরিত্রশক্তির পরিচয় দিতে পারেনি ততদিন সে লবঙ্গলতার সহানুভূতি পায়নি। কিন্তু যে-মুহূর্তে সে অমরনাথের সর্বত্যাগী চরিত্রের পরিচয় পেল, তখনই তার নারীহৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠল। এ জন্যেই লবঙ্গ অমরনাথকে ইঙ্গিত দিয়েছে যে ইহলোকে নয়, 'যদি পরলোক থাকে' তাহলে হয়তো সেখানে তাদের মিলন হতে পারে। জানাল, 'আমি স্ত্রীলোক—সহজে দুর্বলা। আমার কত বল, দেখিয়া তোমার কি হইবে?' লবঙ্গলতার এই মানসিক রূপান্তর যে সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বসম্মত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রকৃতপক্ষে লবঙ্গলতা বঙ্কিমসৃষ্ট একটি অনন্য চরিত্র। নীতিজ্ঞান তাঁকে চালিত করলেও মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে তিনি আরও একবার অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাই যথার্থই বলেছেন, 'নীতিবিদ্ বঙ্কিমচন্দ্র চিত্তসংযমের ব্যাখ্যা করিয়াছেন আর সৌন্দর্য্যস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র মানবহৃদয়ের সুকুমার প্রবৃত্তির মাধুর্য্য আহরণ করিয়াছেন।'

হৃদয়িক বা মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন শুধু লবঙ্গলতার নয়, রজনীরও ঘটেছে। রজনী অন্ধ, কিন্তু শচীন্দ্রের স্পর্শে, কথায়, তার মধ্যে প্রেমের উন্মেষ ঘটে। রজনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম আরও একবার প্রেমের সঙ্গে শরীরের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, এই আধুনিক ধারণাকে ব্যক্ত করেছেন :

> শুষ্ক ভূমিতে বৃষ্টি পড়িলে কেন না সে উৎপাদিনী হইবে? শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি সংলগ্ন হইলে কেন না সে জ্বলিবে? রূপে হোক, শব্দে হোক, স্পর্শে হোক, শূন্য রমণীহৃদয়ে সুপুরুষসংস্পর্শ হইলে কেন প্রেম না জন্মিবে?

এখানে বাঙালি সমাজে এতদিন ধরে প্রচলিত প্রেমের একেবারে নতুন ব্যাখ্যা দিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। শারীরিক আকর্ষণেই ধীরে ধীরে সে শচীন্দ্রের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। কিন্তু এই শারীরিক প্রেমই শেষকথা নয়। আত্মোপলব্ধি না ঘটলে প্রেম পূর্ণতা পায় না। শচীন্দ্রের মধ্যে সন্ন্যাসীর কল্যাণে যখন এই অনুভূতির উন্মেষ ঘটল, তখনই সে রজনীর প্রতি প্রেমাসক্ত হল। তবে তার মধ্যে যে প্রেমের বিকাশ ঘটে তারও মূলে আছে রূপতৃষ্ণা। অন্যকথায় একে আমরা শারীরচেতনাই বলতে পারি। এ জন্যেই শচীন্দ্র রজনীকে মনে করে এমন একটি কথা বলতে পেরেছে :

> শুইয়া শুইয়া কত কি দেখিতাম, তাহা বলিতে পারি না।...কিন্তু যাহাই দেখি না – সকলের মধ্যস্থলে রজনীর সেই প্রস্তরমূর্তি দেখিতে পাইতাম। হায় রজনী! পাথরে এত আগুন!

সহমর্মিতা থেকে শারীরিক আকর্ষণ, শারীরিক আকর্ষণ থেকে প্রেম—এভাবেই পূর্ণতা পায় শচীন্দ্রনাথের প্রেম। কিন্তু শারীরচেতনাই প্রেমের মূল কথা নয়।

এ কারণেই অমরনাথকে একরাতে লবঙ্গলতার ঘরে প্রবেশ করবার জন্য নিগৃহীত হতে হয়েছে। আবার আত্মসংশোধিত অমরনাথ পেয়েছে লবঙ্গলতার অপরিসীম শ্রদ্ধা। প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ধর্ম, মননশীলতা, নিঃস্বার্থপরতা অমরনাথকে রজনীর একটি ব্যক্তিসম্পন্ন রক্তমাংসের চরিত্র করে তুলেছে। তার চরিত্রেরও বিকাশ ঘটেছে মনস্তত্ত্বের পথ ধরে। প্রথম জীবনে প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে অনিকেত সন্ন্যাসজীবন বেছে নিয়েছিল। পরে রজনীকে কেন্দ্র করে গৃহী হতে চেয়েছে। কিন্তু যখনই জানতে পারল রজনী শচীন্দ্রকে ভালোবাসে, তখনই সে আবার পৃথিবীর পথে পা বাড়ায়। মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সে জীবনের সার্থকতা খুঁজে নিতে চেয়েছে।

অমরনাথের মধ্যে কেউ কেউ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের 'আত্মপরিচয় বিধৃত' হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন জিজ্ঞাসার আর্তি, জীবনরহস্যের সন্ধান এতে মূর্ত হয়েছে বলে লক্ষ করেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তীক্ষ্ম মনীষা, পরোপকার প্রবণতা সত্ত্বেও যে চরম শূন্যতার মধ্যে অমরনাথ নিক্ষিপ্ত হয়েছে, সেই পরিণাম লক্ষ করেই এই মন্তব্য করা হয়েছে। অপরিসীম সম্ভাবনা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকার ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈষয়িক জীবনে যে ট্র্যাজেডি নেমে এসেছিল, সেই প্রেক্ষাপটে হয়তো এই মন্তব্যের যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু অমরনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের খুব কি মিল খুঁজে পাব আমরা?

অমরনাথের মধ্যে যে অপ্রাপ্তির বেদনা জেগেছিল তা নিয়তিনির্দেশিত নয়, স্বনির্মিত। এই চরিত্রে শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির প্রক্ষেপ লক্ষণীয়। কিন্তু শেষে শচীন্দ্র-রজনীর মিলন হলে একধরনের প্রাপ্তি ঘটে তার। এই প্রাপ্তিবোধ, কোনো সন্দেহ নেই বঙ্কিমের বিশিষ্ট ভারতীয় জীবনমানসেরই লক্ষণ। এ-দিক থেকে বিবেচনা করলে অমরনাথের সঙ্গে বঙ্কিমজীবনের একটি মিল খুঁজে পাব আমরা।

রজনী উপন্যাসের 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন, 'মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।' মানসিক তত্ত্বটি বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে কীভাবে ফুটে উঠেছে, তা আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ করেছি। এবার নৈতিক তত্ত্বের প্রসঙ্গ।

রজনী উপন্যাসের কাহিনী লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, রূপমোহ বা দর্শনজাত প্রেমই প্রেম নয়। প্রকৃত প্রেম হচ্ছে হার্দ্রিক প্রেম। শুধু দর্শনে যে প্রেম জন্মায়, তা হৃদয়ের অনুভূতিকে নষ্ট করে দেয়। রূপমুগ্ধতা তাই একটা মোহ, প্রেম নয়। শচীন্দ্র তাই রজনীর রূপে লক্ষ করেছে 'এত আগুন'। অমরনাথ 'যৌবনে বসনভূষণের ঘটা, হাসি চাহনির ছটা,—বেণীর দোলনি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি' ইত্যাদি 'যুবতী রূপের বিকাশ'কে বলেছে 'একপ্রকার দোকানদারি'। কিন্তু রজনী প্রশ্ন করেছে, 'চক্ষু থাকিলে এত ভালবাসা বাসিতে

পারে কি?' তার শেষ সিদ্ধান্ত, 'রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকার মাত্র'। রজনীর দুঃখবোধ তাই স্থায়ী হয়নি। দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে তার প্রেম নিকষিত হেম হয়ে উঠেছে। শচীন্দ্র তার অপ্রাপণীয় থাকেনি।

আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে প্রেম ও সৌন্দর্য পরস্পরের পরিপূরক। সৌন্দর্যহীন প্রেম যেমন সুন্দর নয়, তেমনি সৌন্দর্যও প্রেম নয়। বাইরে থেকে আমরা যাকে প্রেম বলি তাই-ই সৌন্দর্য, সৌন্দর্যই প্রেম। বঙ্কিমচন্দ্র নতুন লেখকদের উদ্দেশে তাই বলেছিলেন সৌন্দর্যসৃষ্টি ও মানবের হিতসাধন আকাঙ্ক্ষাই সাহিত্যসৃষ্টির যথার্থ উদ্দেশ্য।

প্রকৃতপক্ষে *রজনী* উপন্যাসে প্রেম কী, রূপ কী, সৌন্দর্য কী, দুঃখ কী, শারীরিক প্রেম কী, ঈশ্বর কী ইত্যাদি নানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। আবার এ-সব প্রসঙ্গের কীভাবে মীমাংসা করা যেতে পারে, তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। গঠনশৈলী, চরিত্রায়ন ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সমগ্রের মধ্যে *রজনী*র স্থান তাই বিশিষ্ট। বঙ্কিমমানস উপলব্ধির জন্যেও উপন্যাসটি সহায়ক হতে পারে নিঃসন্দেহে। এ ছাড়া উত্তরকালের ঔপন্যাসিকগণও এই উপন্যাসের কাছে ঋণী। জাগতিক জীবনের সঙ্গে প্রণয়ের যে দ্বন্দ্ব শরৎসাহিত্যের প্রধান প্রসঙ্গ, তারও সূত্রপাত *রজনী* উপন্যাসে। অন্তর্গত প্রেম জেগে উঠলে তা যে কত বিচিত্রপথগামী হতে পারে, শরৎসাহিত্যে তার সমৃদ্ধ পরিচয় মেলে। *রজনী* উপন্যাসের লবঙ্গলতাই হচ্ছে সেই চরিত্র, যা শরৎচন্দ্রকে হয়তো এরকমটাই ভাবতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু 'লবঙ্গলতা যেখানে থামিয়া গিয়াছে রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, অচলা সেইখানে থামে নাই।' শরৎচন্দ্র আত্মজাগ্রত এই নারীকে তাঁর উপন্যাসে স্থান দিলেও সমাজে তাদের ঠাঁই হয়নি। এখানেই শরৎচন্দ্রের ব্যর্থতা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। নীতিবিহর্গিত প্রেমের অপরাজেয় রূপকে তিনি সেকালের সামাজিক প্রেক্ষাপটে সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। *রজনী* এ-দিক থেকেও বাংলা সাহিত্যের একটি সফল উপন্যাস।

মাসুদুজ্জামান
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অগ্রহায়ণ ১৪০৮

প্রথম খণ্ড

রজনীর কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তোমাদের সুখদুঃখে আমার সুখদুঃখ পরিমিত হইতে পারে না। তোমরা আর আমি ভিন্নপ্রকৃতি। আমার সুখে তোমরা সুখী হইতে পারিবে না—আমার দুঃখ তোমরা বুঝিবে না—আমি একটি ক্ষুদ্র যূথিকার গন্ধে সুখী হইব; আর ষোলোকলা শশী আমার লোচনাগ্রে সহস্র নক্ষত্রমণ্ডলমধ্যস্থ হইয়া বিকশিত হইলেও আমি সুখী হইব না—আমার উপাখ্যান কি তোমরা মন দিয়া শুনিবে? আমি জন্মান্ধ।

কী প্রকারে বুঝিবে? তোমাদের জীবন দৃষ্টিময়—আমার জীবন অন্ধকার—দুঃখ এই, আমি ইহা অন্ধকার বলিয়া জানি না। আমার এ রুদ্ধ নয়নে, তা-ই আলো! না জানি তোমাদের আলো কেমন!

তাই বলিয়া কি আমার সুখ নাই? তাহা নহে। সুখ দুঃখ তোমার আমার প্রায় সমান। তুমি রূপ দেখিয়া সুখী, আমি শব্দ শুনিয়াই সুখী। দেখ, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যূথিকাসকলের বৃন্তগুলি কত সূক্ষ্ম, আর আমার এই করস্থ সূচিকাগ্রভাগ আরও কত সূক্ষ্ম! আমি এই সূচিকাগ্রে সেই ক্ষুদ্র পুষ্পবৃন্তসকল বিদ্ধ করিয়া মালা গাঁথি—আশৈশব মালাই গাঁথিয়াছি—কেহ কখনো আমার গাঁথা মালা পরিয়া বলে নাই যে, কানায় মালা গাঁথিয়াছে।

আমি মালাই গাঁথিতাম। বালিগঞ্জের প্রান্তভাগে আমার পিতার একখানি পুষ্পোদ্যান জমা ছিল—তাহাই তাঁহার উপজীবিকা ছিল। ফাল্গুন মাস হইতে যতদিন ফুল ফুটিত, ততদিন পর্যন্ত পিতা প্রত্যহ তথা হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া দিতেন, আমি মালা গাঁথিয়া দিতাম। পিতা তাহা লইয়া মহানগরীর পথে পথে বিক্রয় করিতেন। মাতা গৃহকর্ম করিতেন। অবকাশমতে পিতামাতা উভয়েই আমার মালা গাঁথার সহায়তা করিতেন।

ফুলের স্পর্শ বড় সুন্দর—পরিতে বুঝি বড় সুন্দর হইবে—ঘ্রাণে পরম সুন্দর বটে। কিন্তু ফুল গাঁথিয়া দিন চলে না। অন্নের বৃক্ষের ফুল নাই। সুতরাং পিতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। মৃজাপুরে একখানি সামান্য খাপরেলের ঘরে বাস করিতেন।

তাহারই এক প্রান্তে, ফুল বিছাইয়া, ফুল স্তূপাকৃত করিয়া, ফুল ছড়াইয়া, আমি ফুল গাঁথিতাম। পিতা বাহির হইয়া গেলে গান গাইতাম—

আমার এত সাধের প্রভাতে সই, ফুটল নাকো কলি—

ও হরি—এখনও আমার বলা হয় নাই, আমি পুরুষ কি মেয়ে! তবে, এতক্ষণে যিনি না বুঝিয়াছেন, তাঁহাকে না-বলাই ভালো। আমি এখন বলিব না।

পুরুষই হই, মেয়েই হই, অন্ধের বিবাহের বড় গোল। কানা বলিয়া আমার বিবাহ হইল না। সেটা দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য, যে চোখের মাথা না খাইয়াছে, সেই বুঝিবে। অনেক, অপাঙ্গরঙ্গরঙ্গিণী, আমার চিরকৌমার্যের কথা শুনিয়া বলিয়া গিয়াছে, 'আহা, আমিও যদি কানা হইতাম!'

বিবাহ না হউক—তাতে আমার দুঃখ ছিল না। আমি স্বয়ম্বরা হইয়াছিলাম। একদিন পিতার কাছে কলিকাতার বর্ণনা শুনিতেছিলাম। শুনিলাম, মনুমেন্ট বড় ভারী ব্যাপার। অতি উঁচু, অটল, অচল, ঝড়ে ভাঙে না, গলায় চেন—একা একাই বাবু। মনে মনে মনুমেন্টকে বিবাহ করিলাম। আমার স্বামীর চেয়ে বড় কে? আমি মনুমেন্টমহিষী।

কেবল একটা বিবাহ নহে। যখন মনুমেন্টকে বিবাহ করি, তখন আমার বয়স পনেরো বৎসর। সতেরো বৎসর বয়সে, বলিতে লজ্জা করে, সধবাবস্থাতেই—আর একটা বিবাহ ঘটিয়া গেল। আমাদের বাড়ির কাছে, কালীচরণ বসু নামে একজন কায়স্থ ছিল। চীনাবাজারে তাহার একখানি খেলনার দোকান ছিল। সে কায়স্থ—আমরা কায়স্থ—এজন্য একটু আত্মীয়তা হইয়াছিল। কালীবসুর একটি চারি বৎসরের শিশুপুত্র ছিল। তাহার নাম বামাচরণ। বামাচরণ সর্বদা আমাদের বাড়িতে আসিত। একদিন একটা বর বাজনা বাজাইয়া মন্দগামী ঝড়ের মতো আমাদিগের বাড়ির সমুখ দিয়া যায়। দেখিয়া বামাচরণ জিজ্ঞাসা করিল, 'ও কে ও?'

আমি বলিলাম, 'ও বর।' বামাচরণ তখন কান্না আরম্ভ করিল—'আমি বল হব।'

তাহাকে কিছুতেই থামাইতে না-পারিয়া বলিলাম, 'কাঁদিস না—তুই আমার বর।' এই বলিয়া একটা সন্দেশ তাহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেমন, তুই আমার বর হবি?' শিশু সন্দেশ হাতে পাইয়া, রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল, 'হব।'

সন্দেশ সমাপ্ত হইলে, বালক ক্ষণেককাল পরে বলিল, 'হাঁ গা, বলে কী কলে গা?' বোধহয় তাহার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বরে বুঝি কেবল সন্দেশই খায়। যদি তা হয়, তবে সে আর একটা আরম্ভ করিতে প্রস্তুত। ভাব বুঝিয়া আমি বলিলাম, 'বরে ফুলগুলি গুছিয়ে দেয়।' বামাচরণ স্বামীর কর্তব্যাকর্তব্য বুঝিয়া লইয়া, ফুলগুলি আমার হাতে গুছাইয়া তুলিয়া দিতে লাগিল। সেই অবধি আমি তাহাকে বর বলি—সে আমাকে ফুল গুছাইয়া দেয়।

আমার এই দুই বিবাহ—এখন একালের জটিলা কুটিলাদিগকে আমার জিজ্ঞাস্য—আমি সতী বলাইতে পারি কি?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বড়বাড়িতে ফুল যোগানো বড় দায়। সেকালের মালিনী মাসি রাজবাটীতে ফুল যোগাইয়া মশানে গিয়াছিল। ফুলের মধু খেলে বিদ্যাসুন্দর, কিল খেলে হীরা মালিনী—কেননা, সে বড়বাড়িতে ফুল যোগাইত। সুন্দরের সেই রামরাজ্য হইল—কিন্তু মালিনীর কিল আর ফিরিল না।

বাবা তো 'বেলফুল' হাঁকিয়া, রসিকমহলে ফুল বেচিতেন, মা দুই-একটা অরসিক মহলে ফুল নিত্য যোগাইতেন। তাহার মধ্যে রামসদয় মিত্রের বাড়িই প্রধান। রামসদয় মিত্রের সাড়ে চারিটা ঘোড়া ছিল। (নাতিদের একটা পণি, আর আদত চারিটা) সাড়ে চারিটা ঘোড়া—আর দেড়খানা গৃহিণী। একজন আদত—একজন চিররুগ্ণা এবং প্রাচীনা। তাঁহার নাম ভুবনেশ্বরী—কিন্তু তাঁর গলার সাঁই সাঁই শব্দ শুনিয়া রামমণি ভিন্ন অন্য নাম আমার মনে আসিত না!

আর যিনি পুরা একখানি গৃহিণী, তাঁহার নাম লবঙ্গলতা। লবঙ্গলতা লোকে বলিত, কিন্তু তাঁহার পিতা নাম রাখিয়াছিলেন ললিতলবঙ্গলতা, এবং রামসদয় বাবু আদর করিয়া বলিতেন—ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে। রামসদয়বাবু প্রাচীন, বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর। ললিতলবঙ্গলতা নবীনা, বয়স ১৯ বৎসর, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোলোআনা গৃহিণী। তিনি রামসদয়ের সিন্দুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চূণ, গেলাশের জল। তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাশিতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল এবং আরোগ্যে সুরুয়া।

নয়ন নাই—ললিতলবঙ্গলতাকে কখনো দেখিতে পাইলাম না—কিন্তু শুনিয়াছি, তিনি রূপসী। রূপ যাউক, গুণ শুনিয়াছি। লবঙ্গ বাস্তবিক গুণবতী। গৃহকার্যে নিপুণা, দানে মুক্তহস্তা, হৃদয়ে সরলা, কেবল বাক্যে বিষময়ী। লবঙ্গলতার অশেষ গুণের মধ্যে একটি এই যে, তিনি বাস্তবিক পিতামহের তুল্য সেই স্বামীকে ভালোবাসিতেন—কোনো নবীনা নবীন স্বামীকে সেরূপ ভালোবাসেন কি না সন্দেহ। ভালোবাসিতেন বলিয়া, তাঁহাকে নবীন সাজাইতেন—সে সজ্জার রস কাহাকে বলি? আপন হস্তে নিত্য শুভ্রকেশে কলপ মাখাইয়া কেশগুলি রঞ্জিত করিতেন। যদি রামসদয় লজ্জার অনুরোধে কোনোদিন মখমলের ধুতি পরিত, স্বহস্তে তাহা ত্যাগ করাইয়া কোকিলপেড়ে, ফিতেপেড়ে, কল্কাপেড়ে পরাইয়া দিতেন—মখমলের ধুতিখানি তৎক্ষণাৎ বিধবা দরিদ্রগণকে বিতরণ করিতেন। রামসদয় প্রাচীন বয়সে, আতরের শিশি দেখিলে ভয়ে পলাইত—লবঙ্গলতা, তাহার নিদ্রিতাবস্থায় সর্বাঙ্গে আতর মাখাইয়া দিতেন। রামসদয়ের চশমাগুলি লবঙ্গ প্রায় চুরি করিয়া ভাঙিয়া ফেলিত; সোনাটুকু লইয়া, যাহার কন্যার বিবাহের সম্ভাবনা, তাহাকে দিত। রামসদয়ের নাক ডাকিলে, লবঙ্গ ছয়গাছা মল বাহির করিয়া, পরিয়া ঘরময় ঝমঝম করিয়া, রামসদয়ের নিদ্রা ভাঙিয়া দিত।

লবঙ্গলতা আমাদের ফুল কিনিত—চারিআনার ফুল লইয়া দুই টাকা মূল্য দিত। তাহার কারণ, আমি কানা। মালা পাইলে, লবঙ্গ গালি দিত, বলিত—এমন কদর্য মালা আমাকে দিস কেন? কিন্তু মূল্য দিবার সময় ডবল পয়সার সঙ্গে ভুল করিয়া টাকা দিত। ফিরাইয়া দিতে গেলে বলিত—ও আমার টাকা নয়—দুই বার বলিতে গেলে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিত। তাহার দানের কথা মুখে আনিলে মারিতে আসিত। বাস্তবিক, রামসদয়বাবুর ঘর না থাকিলে, আমাদিগের দিনপাত হইত না; তবে যাহা রয় সয়, তাই ভালো বলিয়া, মাতা, লবঙ্গের কাছে অধিক লইতেন না। দিনপাত হইলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম। লবঙ্গলতা আমাদিগের নিকট রাশি রাশি ফুল কিনিয়া রামসদয়কে সাজাইত। সাজাইয়া বলিত—দেখ, রতিপতি। রামসদয় বলিত—দেখ, সাক্ষাৎ অঞ্জনানন্দন। সেই প্রাচীনে নবীনে মনের মিল ছিল—দর্পণের মতো দুইজনে দুইজনের মন দেখিতে পাইত। তাহাদের প্রেমের পদ্ধতিটা এইরূপ—

রামসদয় বলিত, 'ললিতলবঙ্গলতাপরিশী—?'

লবঙ্গ। আজ্ঞে ঠাকুরদাদামহাশয়, দাসী হাজির।

রাম। আমি যদি মরি?

লব। 'আমি তোমার বিষয় খাইব।' লবঙ্গ মনে মনে বলিত, 'আমি বিষ খাইব।' রামসদয় তাহা মনে মনে জানিত।

লবঙ্গ এত টাকা দিত, তবে বড়বাড়িতে ফুল যোগানো দুঃখ কেন? শুনো।

একদিন মার জ্বর। অন্তঃপুরে বাবা যাইতে পারিবেন না—তবে আমি বৈ আর কে লবঙ্গলতাকে ফুল দিতে যাইবে? আমি লবঙ্গের জন্য ফুল লইয়া চলিলাম। অন্ধ হই, যাই হই—কলিকাতার রাস্তাসকল আমার নখদর্পণে ছিল। বেত্রহস্তে সর্বত্র যাইতে পারিতাম, কখনো গাড়িঘোড়ার সমুখে পড়ি নাই। অনেকবার পদচারীর ঘাড়ে পড়িয়াছি বটে—তাহার কারণ, কেহ কেহ অন্ধ যুবতী দেখিয়া সাড়া দেয় না, বরং বলে, 'আ মলো! দেখতে পাস্‌নে? কানা নাকি?' আমি ভাবিতাম, 'উভয়তঃ।'

ফুল লইয়া গিয়া লবঙ্গের কাছে গেলাম। দেখিয়া লবঙ্গ বলিলেন, 'কি লো কানী—আবার ফুল লইয়া মর্‌তে এয়েছিস্‌ কেন?' কানী বলিলে আমার হাড় জ্বলিয়া যাইত—আমি কী কদর্য উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, এমত সময়ে সেখানে হঠাৎ কাহার পদধ্বনি শুনিলাম—কে আসিল। সে আসিল—বলিল, 'এ কে ছোটমা?'

ছোটমা! তবে রামসদয়ের পুত্র। রামসদয়ের কোন্‌ পুত্র? বড়পুত্রের কণ্ঠ একদিন শুনিয়াছিলাম—সে এমন অমৃতময় নহে—এমন করিয়া কর্ণবিবর ভরিয়া, সুখ ঢালিয়া দেয় নাই। বুঝিলাম, এ ছোটবাবু।

ছোটমা বলিলেন, এবার বড় মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, 'ও কানা ফুলওয়ালী।'

'ফুলওয়ালী! আমি বলি বা কোনো ভদ্রলোকের মেয়ে।'

লবঙ্গ বলিলেন, 'কেন গা, ফুলওয়ালী হইলে কি ভদ্রলোকের মেয়ে হয় না?'

ছোটবাবু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, 'হবে না কেন? এটি তো ভদ্রলোকের মেয়ের মতোই বোধ হইতেছে। তা ওটি কানা হইল কিসে?'

লবঙ্গ। ও জন্মান্ধ।

ছোটবাবু। দেখি?

ছোটবাবুর বড় বিদ্যার গৌরব ছিল। তিনি অন্যান্য বিদ্যাও যেরূপ যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থের প্রত্যাশী না হইয়া চিকিৎসাশাস্ত্রেও সেইরূপ যত্ন করিয়াছিলেন। লোকে রাষ্ট্র করিত যে, শচীন্দ্রবাবু (ছোটবাবু) কেবল দরিদ্রগণের বিনামূল্যে চিকিৎসা করিবার জন্য চিকিৎসা শিখিতেছিলেন। 'দেখি' বলিয়া আমাকে বলিলেন, 'একবার দাঁড়াও তো গা!'

আমি জড়সড় হইয়া দাঁড়াইলাম।

ছোটবাবু বলিলেন, 'আমার দিকে চাও'।

চাব কী ছাই!

'আমার দিকে চোখ ফিরাও!'

কানা চোখে শব্দভেদী বাণ মরিলাম। ছোটবাবুর মনের মতো হইল না। তিনি আমার দাড়ি ধরিয়া, মুখ ফিরাইলেন।

ডাক্তারির কপালে আগুন জ্বেলে দিই। সেই চিবুকস্পর্শে আমি মরিলাম!

সেই স্পর্শ পুষ্পময়। সেই স্পর্শে যূথী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি—সব ফুলের ঘ্রাণ পাইলাম। বোধ হইল, আমার আশেপাশে ফুল, আমার মাথায় ফুল, আমার পায়ে ফুল, আমার পরনে ফুল, আমার বুকের ভিতর ফুলের রাশি। আ মরি মরি! কোন্ বিধাতা এ কুসুমময় স্পর্শ গড়িয়াছিল! বলিয়াছি তো কানার সুখদুঃখ তোমরা বুঝিবে না। আ মরি মরি—সে নবনীত—সুকুমার—পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ! বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ, যার চোখ আছে, সে বুঝিবে কী প্রকারে? আমার সুখদুঃখ আমাতেই থাকুক। যখন সেই স্পর্শ মনে পড়িত, তখন কত বীণাধ্বনি কর্ণে শুনিতাম, তাহা তুমি, বিলোলকটাক্ষকুশলিনী! কী বুঝিবে?

ছোটবাবু বলিলেন, 'না এ কানা সারিবার নয়।'

আমার তো সেইজন্য ঘুম হইতেছিল না।

লবঙ্গ বলিল, 'তা না, সারুক, টাকা খরচ করিলে কানার কি বিয়ে হয় না?

ছোটবাবু। কেন, এর কি বিবাহ হয় নাই?

লবঙ্গ। না। টাকা খরচ করিলে হয়?

ছোটবাবু। আপনি কি ইহার বিবাহ জন্য টাকা দিবেন?

লবঙ্গ রাগিল। বলিল, 'এমন ছেলেও দেখি নাই! আমার কি টাকা রাখিবার জায়গা নাই? বিয়ে কি হয়, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। মেয়েমানুষ, সকল কথা তো জানি না। বিবাহ কি হয়?'

ছোটবাবু ছোটমাকে চিনিতেন। হাসিয়া বলিলেন, 'তা মা, তুমি টাকা রেখো, আমি সম্বন্ধ করিব।'

মনে মনে ললিতলবঙ্গলতার মুণ্ডপাত করিতে করিতে আমি সে-স্থান হইতে পলাইলাম।

তাই বলিতেছিলাম, বড়মানুষের বাড়ি ফুল যোগানো বড় দায়।

বহুমূর্তিময়ী বসুন্ধরে! তুমি দেখিতে কেমন? তুমি যে অসংখ্য, অচিন্তনীয় শক্তি ধরো, অনন্ত বৈচিত্র্যবিশিষ্ট জড় পদার্থসকল হৃদয়ে ধারণ করো, সেসব দেখিতে কেমন? যাকে যাকে লোকে সুন্দর বলে, সেসব দেখিতে কেমন? তোমার হৃদয়ে যে অসংখ্য বহুপ্রকৃতিবিশিষ্ট জন্তুগণ বিচরণ করে, তারা সব দেখিতে কেমন? বলো মা, তোমার হৃদয়ের সারভূত, পুরুষজাতি দেখিতে কেমন? দেখাও মা, তাহার মধ্যে, যাহার করস্পর্শে এত সুখ, সে দেখিতে কেমন? দেখা মা, দেখিতে কেমন দেখায়? দেখা কী? দেখা কেমন? দেখিলে কিরূপ সুখ হয়? এক মুহূর্তজন্য এই সুখময় স্পর্শ দেখিতে পাই না? দেখা মা! বাহিরের চক্ষু নিমীলিত থাকে থাকুক মা! আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অন্তরের ভিতর অন্তর লুকাইয়া, মনের সাধে রূপ দেখে, নারীজন্ম সার্থক করি। সবাই দেখে—আমি দেখিব না কেন? বুঝি কীটপতঙ্গ অবধি দেখে—আমি কী অপরাধে দেখিতে পাই না? শুধু দেখা—কারও ক্ষতি নাই, কারও কষ্ট নাই, কারও পাপ নাই, সবাই অবহেলে দেখে—কী দোষে আমি কখনও দেখিব না?

না! না! অদৃষ্টে নাই। হৃদয়মধ্যে খুঁজিলাম। শুধু শব্দ স্পর্শ গন্ধ। আর কিছু পাইলাম না।

আমার অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি উঠিতে লাগিল কে দেখাবি দেখা গো—আমায় রূপ দেখা!

বুঝিল না! কেহই অন্ধের দুঃখ বুঝিল না!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেই অবধি আমি প্রায় প্রত্যহ রামসদয় মিত্রের বাড়ি ফুল বেচিতে যাইতাম। কিন্তু কেন, তাহা জানি না। যাহার নয়ন নাই, তাহার এ যত্ন কেন? সে দেখিতে পাইবে না—কেবল কথার শব্দ শুনিবার ভরসা মাত্র। কেন শচীন্দ্রবাবু আমার কাছে আসিয়া কথা কহিবেন? তিনি থাকেন সদরে—আমি যাই অন্তঃপুরে। যদি তাহার স্ত্রী থাকিত, তবেও বা কখনো আসিতেন। কিন্তু বৎসরেক পূর্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল—আর বিবাহ করেন নাই। অতএব সে ভরসাও নাই। কদাচিৎ কোনো প্রয়োজনে মাতাদিগের নিকটে আসিতেন। আমি যে-সময়ে ফুল লইয়া যাইব, তিনিও ঠিক সেই সময়ে আসিবেন, তাহারই বা সম্ভাবনা কী? অতএব যে এক শব্দ শুনিবার মাত্র আশা, তাহাও বড় সফল হইত না। তথাপি অন্ধ প্রত্যহ ফুল লইয়া যাইত। কোন্ দুরাশায় তাহা জানি না। নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় প্রত্যহ ভাবিতাম, আমি কেন আসি? প্রত্যহ মনে করিতাম, আর আসিব না। প্রত্যহই সে কল্পনা বৃথা হইত। প্রত্যহই আবার যাইতাম। যেন কে চুল ধরিয়া লইয়া যাইত। আবার নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতাম, আবার প্রতিজ্ঞা করিতাম, যাইব না—আবার যাইতাম। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

মনে মনে আলোচনা করিতাম, কেন যাই? শুনিয়াছি, স্ত্রীজাতি পুরুষের রূপে মুগ্ধ

হইয়া ভালোবাসে। আমি কানা, তাহার রূপ দেখিয়াছি? তবে কেন যাই? কথা শুনিব বলিয়া? কখনো কেহ শুনিয়াছে যে, কোনো রমণী শুধু কথা শুনিয়া উন্মাদিনী হইয়াছে? আমিই কি তাই হইয়াছি? তাও কি সম্ভব? যদি তাই হয়, তবে বাদ্য শুনিবার জন্য, বাদকের বাড়ি যাই না কেন? সেতার, সারেঙ্গ, এসরাজ, বেহালার অপেক্ষা কি শচীন্দ্র সুকণ্ঠ? সে-কথা মিথ্যা।

তবে কি সেই স্পর্শ? আমি যে-কুসুমরাশি রাত্রি দিবা লইয়া আছি, কখনো পাতিয়া শুইতেছি, কখনো বুকে চাপাইতেছি—ইহার অপেক্ষা তাহার স্পর্শ কোমল? তা তো নয়। তবে কী? এই কানাকে কে বুঝাইবে? তবে কী?

তোমরা বুঝো না, বুঝাইবে কী? তোমাদের চক্ষু আছে, রূপ চেনো, রূপই বুঝো। আমি জানি, রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকার মাত্র—শব্দও মানসিক বিকার। রূপ রূপবানে নাই, রূপ দর্শকের মনে—নহিলে একজনকে সকলেই সমান রূপবান দেখে না কেন? একজনে সকলেই আসক্ত হয় না কেন? সেইরূপ শব্দও তোমার মনে। রূপ দর্শকের একটি মনের সুখ মাত্র, শব্দও শ্রোতার একটি মনের সুখ মাত্র, স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখ মাত্র। যদি আমার রূপসুখের পথ বন্ধ থাকে, তবে শব্দ স্পর্শ গন্ধ কেন রূপসুখের ন্যায় মনোমধ্যে সর্বময় না হইবে?

শুষ্ক ভূমিতে বৃষ্টি পড়িলে কেন না সে উৎপাদিনী হইবে? শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি সংলগ্ন হইলে কেন না সে জ্বলিবে? রূপে হোক, শব্দে হোক, স্পর্শে হোক, শূন্য রমণীহৃদয়ে সুপুরুষসংস্পর্শ হইলে কেন প্রেম না জন্মিবে? দেখ, অন্ধকারেও ফুল ফুটে, মেঘে ঢাকিলেও চাঁদ গগনে বিহার করে, জনশূন্য অরণ্যেও কোকিল ডাকে, যে সাগরগর্ভে মনুষ্য কখনো যাইবে না, সেখানেও রত্ন প্রভাসিত হয়, অন্ধের হৃদয়েও প্রেম জন্মে, আমার নয়ন নিরুদ্ধ বলিয়া হৃদয় কেন প্রস্ফুটিত হইবে না?

হইবে না কেন, কিন্তু সে কেবল আমার যন্ত্রণার জন্য। বোবার কবিত্ব, কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য। বধিরের সঙ্গীতানুরাগ যদি হয়, কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য, আপনার গীত আপনি শুনিতে পায় না। আমার হৃদয়ে প্রণয়সঞ্চার তেমনই যন্ত্রণার জন্য। পরের রূপ দেখিব কী—আমি আপনার রূপ কখনো আপনি দেখিলাম না। রূপ! রূপ! আমার কী রূপ! এই ভূমণ্ডলে রজনীনামে ক্ষুদ্রবিন্দু কেমন দেখায়? আমাকে দেখিলে, কখনও কি কাহারো আবার ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় নাই? এমন নীচাশয়, ক্ষুদ্র কেহ কি জগতে নাই যে, আমাকে সুন্দর দেখে? নয়ন না থাকিলে নারী সুন্দর হয় না—আমার নয়ন নাই—কিন্তু তবে কারিগরে পাথর খোদিয়া চক্ষুঃশূন্য মূর্তি গড়ে কেন? আমি কি কেবল সেইরূপ পাষাণী মাত্র? তবে বিধাতা এ পাষাণমধ্যে এ সুখদুঃখসমাকুল প্রণয়লালসাপরবশ হৃদয় কেন পুরিল? পাষাণের দুঃখ পাইয়াছি, পাষাণের সুখ পাইলাম না কেন? এ সংসারে এ তারতম্য কেন? অনন্ত দুষ্কৃতিকারীও চক্ষে দেখে, আমি জন্মপূর্বেই কোন্ দোষ করিয়াছিলাম যে, আমি চক্ষে দেখিতে পাইব না? এ সংসারে বিধাতা নাই, বিধান নাই, পাপপুণ্যের দণ্ড পুরস্কার নাই—আমি মরিব।

আমার এই জীবনে বহু বৎসর গিয়াছে—বহু বৎসর আসিতেও পারে! বৎসরে

বৎসরে বহু দিবস—দিবসে দিবসে বহু দণ্ড—দণ্ডে দণ্ডে বহু মুহূর্ত—তাহার মধ্যে এক মুহূর্ত জন্য, এক পলক জন্য, আমার কি চক্ষু ফুটিবে না? এক মুহূর্ত জন্য, চক্ষু মেলিতে পারিলে দেখিয়া লই, এই শব্দস্পর্শময় বিশ্বসংসার কী—আমি কী—শচীন্দ্র কী?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমি প্রত্যহই ফুল লইয়া যাইতাম, ছোটবাবুর কথার শব্দশ্রবণ প্রায় ঘটিত না—কিন্তু কদাচিৎ দুই-একদিন ঘটিত। সে আহ্লাদের কথা বলিতে পারি না। আমার বোধ হইত, বর্ষার জলভরা মেঘ যখন ডাকিয়া বর্ষে, তখন মেঘের বুঝি সেইরূপ আহ্লাদ হয়; আমারও সেইরূপ ডাকিতে ইচ্ছা করিত। আমি প্রত্যহ মনে করিতাম, আমি ছোটবাবুকে কতকগুলি বাছা ফুলের তোড়া বাঁধিয়া দিয়া আসিব—কিন্তু তাহা একদিনও পারিলাম না। একে লজ্জা করিত—আবার মনে ভাবিতাম, ফুল দিলে তিনি দাম দিতে চাহিবেন—কী বলিয়া না লইব? মনের দুঃখে ঘরে আসিয়া ফুল লইয়া ছোটবাবুকেই গড়িতাম। কী গড়িতাম, তাহা জানি না—কখনো দেখি নাই।

এদিকে আমার যাতায়াতে একটি অচিন্তনীয় ফল ফলিতেছিল—আমি তাহার কিছুই জানিতাম না। পিতা-মাতার কথোপকথনে তাহা প্রথম জানিতে পারিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর, আমি মালা গাঁথিতে গাঁথিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। কী একটা শব্দে নিদ্রা ভাঙিল। জাগ্রত হইলে কর্ণে পিতা-মাতার কথোপকথনের শব্দ প্রবেশ করিল। বোধহয়, প্রদীপ নিবিয়া গিয়া থাকিবে; কেননা, পিতা-মাতা আমার নিদ্রাভঙ্গ জানিতে পারিলেন, এমত বোধ হইল না। আমিও আমার নাম শুনিয়া কোনো সাড়াশব্দ করিলাম না। শুনিলাম, মা বলিতেছেন, 'তবে একপ্রকার স্থিরই হইয়াছে?'

পিতা উত্তর করিলেন, 'স্থির বৈ কি? অমন বড়মানুষ লোক, কথা দিলে কি আর নড়চড় আছে? আর আমার মেয়ের দোষের মধ্যে অন্ধ, নহিলে অমন মেয়ে লোকে তপস্যা করিয়া পায় না।'

মা। তা, পরে এত করবে কেন?

পিতা। তুমি বুঝিতে পারো না যে, ওরা আমাদের মতো টাকার কাঙাল নয়—হাজার দুহাজার টাকা ওরা টাকার মধ্যে ধরে না। যেদিন রজনীর সাক্ষাতে রামসদয়বাবুর স্ত্রী বিবাহের কথা প্রথম পাড়িলেন, সেইদিন হইতে রজনী তাঁহার কাছে প্রত্যহ যাতায়াত আরম্ভ করিল। তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'টাকায় কি কানার বিয়ে হয়?' ইহাতে অবশ্য মেয়ের মনে আশা-ভরসা হইতে পারে যে, বুঝি ইনি দয়াবতী হইয়া টাকা খরচ করিয়া আমার বিবাহ দিবেন। সেইদিন হইতে রজনী নিত্য যায় আসে। সেইদিন হইতে নিত্য যাতায়াত দেখিয়া লবঙ্গ বুঝিলেন যে, মেয়েটি বিবাহের জন্য বড় কাতর হয়েছে—না হবে কেন, বয়স তো হয়েছে! তাতে আবার ছোটবাবু টাকা দিয়া হরনাথ বসুকে রাজি করিয়াছেন। গোপালও রাজি হইয়াছে।

হরনাথ বসু রামসদয়বাবুর বাড়ির সরকার। গোপাল তাহার পুত্র। গোপালের

কথা কিছু কিছু জানিতাম। গোপালের বয়স ত্রিশ বৎসর—একটি বিবাহ আছে, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। গৃহধর্মার্থে তাহার গৃহিণী আছে—সন্তানার্থ অন্ধ-পত্নীতে তাহার আপত্তি নাই। বিশেষ লবঙ্গ তাহাকে টাকা দিবে। পিতা-মাতার কথায় বুঝিলাম, গোপালের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে—টাকার লোভে সে কুড়ি বৎসরের মেয়েও বিবাহ করিতে প্রস্তুত। টাকায় জাতি কিনিবে। পিতা-মাতা মনে করিলেন, এ জন্মের মতো অন্ধকন্যা উদ্ধার প্রাপ্ত হইল। তাঁহারা আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। আমার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল।

তার পরদিন স্থির করিলাম, আর আমি লবঙ্গের কাছে যাইব না—মনে মনে তাহাকে শতবার পোড়ারমুখী বলিয়া গালি দিলাম। লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। রাগে লবঙ্গকে মারিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। দুঃখে কান্না আসিতে লাগিল। আমি লবঙ্গের কী করিয়াছি যে, সে আমার উপর এত অত্যাচার করিতে উদ্যত? ভাবিলাম, যদি সে বড়মানুষ বলিয়া অত্যাচার করিয়াই সুখী হয়, তবে জন্মান্ধ দুঃখিনী ভিন্ন, আর কি অত্যাচার করিবার পাত্র পাইল না? মনে করিলাম—না, আর একদিন যাইব, তাহাকে এমনই করিয়া তিরস্কার করিয়া আসিব—তারপর আর যাইব না—আর ফুল বেচিব না—আর তাহার টাকা লইব না—মা যদি তাহাকে ফুল দিয়া মূল্য লইয়া আসেন, তবে তাহার টাকার অন্ন ভোজন করিব না—না খাইয়া মরিতে হয়—সেও ভালো। ভাবিলাম, বলিব, বড়মানুষ হইলেই কি পরপীড়ন করিতে হয়? বলিব, আমি অন্ধ—অন্ধ বলিয়া কি দয়া হয় না? বলিব, পৃথিবীতে যাহার কোনো সুখ নাই, তাহাকে বিনাপরাধে কষ্ট দিয়া তোমার কী সুখ? যত ভাবি, এই এই বলিব, তত আপনার চক্ষের জলে আপনি ভাসি। মনে ভয় হইতে লাগিল, পাছে বলিবার সময় কথাগুলি ভুলিয়া যাই।

যথাসময়ে আবার রামসদয়বাবুর বাড়ি চলিলাম। ফুল লইয়া যাইব না মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু শুধুহাতে যাইতে লজ্জা করিতে লাগিল—কী বলিয়া গিয়া বসিব। পূর্বমতো কিছু ফুল লইলাম। কিন্তু আজি মাকে লুকাইয়া গেলাম।

ফুল দিলাম—তিরস্কার করিব বলিয়া লবঙ্গের কাছে বসিলাম। কী বলিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব? হরি! হরি! কী বলিয়া আরম্ভ করিব? গোড়ার কথা কোন্‌টা? যখন চারিদিকে আগুন জ্বলিতেছে—আগে কোন দিক নিবাইব? কিছু বলা হইল না! কথা পাড়িতেই পারিলাম না। কান্না আসিতে লাগিল।

ভাগ্যক্রমে লবঙ্গ আপনিই প্রসঙ্গ তুলিল, 'কানী—তোর বিয়ে হবে।'

আমি জ্বলিয়া উঠিলাম। বলিলাম, 'ছাই হবে।'

লবঙ্গ বলিল, 'কেন, ছোটবাবু বিবাহ দেওয়াইবেন—হবে না কেন?'

আরও জ্বলিলাম। বলিলাম, 'কেন, আমি তোমাদের কাছে কী দোষ করেছি?'

লবঙ্গও রাগিল। বলিল, 'আহ্ মলো! তোর কি বিয়ের মন নাই নাকি?'

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, 'না।'

লবঙ্গ আরও রাগিল, বলিল, 'পাপিষ্ঠা কোথাকার! বিয়ে করবিনে কেন?'

আমি বলিলাম, 'খুশি।'

লবঙ্গের মনে বোধহয় সন্দেহ হইল—আমি ভ্রষ্টা—নহিলে বিবাহে অসম্মত কেন? সে বড় রাগ করিয়া বলিল, 'আহ্ মলো! বেরো বলিতেছি—নহিলে খেঙ্রা মারিয়া বিদায় করিব।'

আমি উঠিলাম—আমার দুই অন্ধচক্ষে জল পড়িতেছিল—তাহা লবঙ্গকে দেখাইলাম না—ফিরিলাম। গৃহে যাইতেছিলাম, সিঁড়িতে আসিয়া একটু ইতস্তত করিতেছিলাম—কই, তিরস্কারের কথা কিছুই তো বলা হয় নাই—অকস্মাৎ কাহার পদশব্দ শুনিলাম। অন্ধের শ্রবণশক্তি অনৈসর্গিক প্রখরতা প্রাপ্ত হয়—আমি দুই-একবার সেই পদশব্দ শুনিয়াই চিনিয়াছিলাম, কাহার পদবিক্ষেপের এ শব্দ। আমি সিঁড়িতে বসিলাম। ছোটবাবু আমার নিকটে আসিলে, আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন। বোধহয়, আমার চক্ষের জল দেখিতে পাইয়াছিলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে, রজনী!'

সকল ভুলিয়া গেলাম! রাগ ভুলিলাম। অপমান ভুলিলাম, দুঃখ ভুলিলাম। কানে বাজিতে লাগিল—'কে, রজনী!' আমি উত্তর করিলাম না—মনে করিলাম, আর দুই-একবার জিজ্ঞাসা করুন—আমি শুনিয়া কান জুড়াই।

ছোটবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রজনী! কাঁদিতেছ কেন?'

আমার অন্তর আনন্দে ভরিতে লাগিল—চক্ষের জল আরও উছলিতে লাগিল। আমি কথা কহিলাম না—আরও জিজ্ঞাসা করুন। মনে করিলাম, আমি কী ভাগ্যবতী! বিধাতা আমায় কানা করিয়াছেন, কালা করেন নাই।

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন কাঁদিতেছ? কেহ কিছু বলিয়াছে?'

আমি সেবার উত্তর করিলাম—তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনের সুখ, যদি জন্মে একবার ঘটিতেছে—তবে ত্যাগ করি কেন? আমি বলিলাম, 'ছোটমা তিরস্কার করিয়াছেন।'

ছোটবাবু হাসিলেন—বলিলেন, 'ছোটমার কথা ধরিও না—তাঁর মুখ ঐরকম—কিন্তু মনে রাগ করেন না। তুমি আমার সঙ্গে এসো—এখনই তিনি আবার ভালো কথা বলিবেন।'

তাঁহার সঙ্গে কেন না যাইব? তিনি ডাকিলে কি আর রাগ থাকে? আমি উঠিলাম—তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। তিনি সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন—আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, 'তুমি দেখিতে পাও না—সিঁড়িতে উঠো কিরূপে? না পারো, আমি হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছি।'

আমার গা কাঁপিয়া উঠিল—সর্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল—তিনি আমার হাত ধরিবেন! ধরুন না—লোকে নিন্দা করে করুক—আমার নারীজন্ম সার্থক হউক! আমি পরের সাহায্য ব্যতীত কলিকাতার গলি গলি বেড়াইতে পারি, কিন্তু ছোটবাবুকে নিষেধ করিলাম না। ছোটবাবু—বলিব কী? কী বলিয়া বলিব—উপযুক্ত কথা পাই না—ছোটবাবু হাত ধরিলেন।

যেন একটি প্রভাতপ্রফুল্ল পদ্ম দলগুলির দ্বারা আমার প্রকোষ্ঠ বেড়িয়া ধরিল—যেন গোলাবের মালা গাঁথিয়া কে আমার হাতে বেড়িয়া দিল! আমার আর

কিছু মনে নাই। বুঝি সেই সময় ইচ্ছা হইয়াছিল—এখন মরি না কেন? বুঝি তখন গলিয়া জল হইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল—বুঝি ইচ্ছা করিয়াছিল, শচীন্দ্র আর আমি, দুইটি ফুল হইয়া এইরূপ সংস্পৃষ্ট হইয়া কোনো বন্যবৃক্ষে গিয়া এক বোঁটায় ঝুলিয়া থাকি। আর কী মনে হইয়াছিল—তাহা মনে নাই। যখন সিঁড়ির উপরে উঠিয়া ছোটবাবু হাত ছাড়িয়া দিলেন—তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম—এ সংসার আবার মনে পড়িল—সেইসঙ্গে মনে পড়িল—'কী করিলে প্রাণেশ্বর! না বুঝিয়া কী করিলে! তুমি আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ। এখন তুমি আমায় গ্রহণ কর না কর—তুমি আমার স্বামী—আমি তোমার পত্নী—ইহজন্মে অন্ধ ফুলওয়ালীর আর কেহ স্বামী হইবে না।'

সেই সময় কি পোড়া লোকের চোখ পড়িল? বুঝি তাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছোটবাবু ছোটমার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রজনীকে কী বলিয়াছ গা? সে কাঁদিতেছে।' ছোটমা আমার চক্ষে জল দেখিয়া অপ্রতিভ হইলেন—আমাকে ভালো কথা বলিয়া কাছে বসাইলেন—বয়োজ্যেষ্ঠ সপত্নীপুত্রের কাছে সকল কথা ভাঙিয়া বলিতে পারিলেন না। ছোটবাবু মাকে প্রসন্ন দেখিয়া নিজ প্রয়োজনে বড়মার কাছে চলিয়া গেলেন। আমিও বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

এদিকে গোপালবাবুর সঙ্গে আমার বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। দিন স্থির হইল। আমি কী করিব? ফুল গাঁথা বন্ধ করিয়া, দিবারাত্র কিসে এ বিবাহ বন্ধ করিব—সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। এ বিবাহে মাতার আনন্দ, পিতার উৎসাহ, লবঙ্গলতার যত্ন, ছোটবাবু ঘটক—এই কথাটি সর্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক—ছোটবাবু ঘটক! আমি একা অন্ধ কী প্রকারে ইহার প্রতিবন্ধকতা করিব? কোনো উপায় দেখিতে পাইলাম না। মালা গাঁথা বন্ধ হইল। মাতাপিতা মনে করিলেন, বিবাহের আনন্দে আমি বিহ্বল হইয়া মালা গাঁথা ত্যাগ করিয়াছি।

ঈশ্বর আমাকে এক সহায় আনিয়া দিলেন। বলিয়াছি, গোপাল বসুর বিবাহ ছিল—তাঁহার পত্নীর নাম চাঁপা—বাপ রেখেছিল চম্পকলতা। চাঁপাই কেবল এ বিবাহে অসম্মত। চাঁপা একটু শক্ত মেয়ে। যাহাতে ঘরে সপত্নী না হয়—তাহার চেষ্টার কিছু ত্রুটি করিল না।

হীরালাল নামে চাঁপার এক ভাই ছিল—চাঁপার অপেক্ষা দেড় বৎসরের ছোট। হীরালাল মদ খায়—তাহাও অল্প মাত্রায় নহে। শুনিয়াছি, গাঁজাও টানে। তাহার পিতা তাহাকে লেখাপড়া শিখান নাই—কোনোপ্রকারে সে হস্তাক্ষরটি প্রস্তুত করিয়াছিল মাত্র, তথাপি রামসদয়বাবু তাহাকে কোথা কেরানিগিরি করিয়া দিয়াছিলেন। মাতলামির দোষে সে চাকরিটি গেল। হরনাথ বসু তাহার দমে ভুলিয়া, লাভের আশায় তাহাকে দোকান করিয়া দিলেন। দোকানে লাভ দূরে থাক, দেনা পড়িল—দোকান উঠিয়া গেল। তার পর কোনো গ্রামে, বারো টাকা বেতনে

হীরালাল মাস্টার হইয়া গেল। সে গ্রামে মদ পাওয়া যায় না বলিয়া হীরালাল পলাইয়া আসিল। তারপর সে একখানা খবরের কাগজ করিল। দিনকতক তাহাতে খুব লাভ হইল, বড় পসার জাঁকিল—কিন্তু অশ্লীলতা দোষে পুলিশে টানাটানি আরম্ভ করিল—ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া রুপোষ হইল। কিছুদিন পরে হীরালাল আবার হঠাৎ ভাসিয়া উঠিয়া ছোটবাবুর মোসায়েবি করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ছোটবাবুর কাছে মদের চাল নাই দেখিয়া আপনাআপনি সরিল। অনন্যোপায় হইয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করিল। নাটক একখানিও বিক্রয় হইল না। তবে ছাপাখানার দেনা শোধিতে হয় না বলিয়া সে-যাত্রা রক্ষা পাইল। এক্ষণে এ ভবসংসারে আর কূলকিনারা না দেখিয়া—হীরালাল চাঁপাদিদির আঁচল ধরিয়া বসিয়া রহিল।

চাঁপা হীরালালকে স্বকার্যোদ্ধার জন্য নিয়োজিত করিল। হীরালাল ভগিনীর কাছে সবিশেষ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'টাকার কথা সত্য তো? যেই কানীকে বিবাহ করিবে, সেই টাকা পাইবে?'

চাঁপা সে-বিষয়ে সন্দেহভঞ্জন করিল। হীরালালের টাকার বড় দরকার। সে তখনই আমার পিতৃভবনে আসিয়া দর্শন দিল। পিতা তখন বাড়ি ছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। আমি নিকটস্থ অন্য ঘরে ছিলাম—অপরিচিত পুরুষে পিতার সঙ্গে কথা কহিতেছে, কণ্ঠস্বরে জানিতে পারিয়া, কান পাতিয়া কথাবার্তা শুনিতে লাগিলাম। হীরালালের কী কর্কশ কদর্য স্বর!

হীরালাল বলিতেছে, 'সতীনের উপর কেন মেয়ে দিবে?'

পিতা দুঃখিতভাবে বলিলেন, 'কী করি! না দিল তো বিয়ে হয় না—এত কাল তো হল না!'

হীরালাল। কেন, তোমার মেয়ের বিবাহের ভাবনা কী?

পিতা হাসিলেন, বলিলেন, 'আমি গরিব—ফুল বেচিয়া খাই—আমার মেয়ে কে বিবাহ করিবে? তাতে আবার কানা মেয়ে, আবার বয়সও ঢের হয়েছে।'

হীরা। কেন, পাত্রের অভাব কী? আমায় বলিলে আমি বিয়ে করি। এখন বয়স্থা মেয়ে তো লোকে চায়। আমি যখন স্তুশ্চুভিশ্চশাৎ পত্রিকার এডিটার ছিলাম, তখন আমি মেয়ে বড় করিয়া বিবাহ দিবার জন্য কত আর্টিকেল লিখেছি—পড়িয়া আকাশের মেঘ ডেকে উঠেছিল। বাল্যবিবাহ! ছি! ছি! মেয়ে তো বড় করিয়াই বিবাহ দিবে। এসো! আমাকে দেশের উন্নতির একজাম্পল সেট্ করিতে দাও—আমিই এ মেয়ে বিয়ে করিব।

আমরা তখন হীরালালের চরিত্রের কথা সবিশেষ শুনি নাই—পশ্চাৎ শুনিয়াছি। পিতা ইতস্তত করিতে লাগিলেন। এতবড় পণ্ডিত জামাই হাতাছাড়া হয় ভাবিয়া শেষে একটু দুঃখিত হইলেন; শেষে বলিলেন, 'এখন কথা ধার্য হইয়া গিয়াছে—এখন আর নড়চড় হয় না। বিশেষ এ বিবাহের কর্তা শচীন্দ্রবাবু। তাঁহারাই বিবাহ দিতেছেন। তাঁহারা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তাঁহারাই গোপালবাবুর সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছেন।'

হীরা। তাদের মতলব তুমি কী বুঝিবে? বড়মানুষের চরিত্রের অন্ত পাওয়া ভার। তাঁদের বড় বিশ্বাস করিও না।

এই বলিয়া হীরালাল চুপি চুপি কী বলিল, তাহা শুনিতে পাইলাম না। পিতা বলিলেন, 'সে কী ! না—আমার কানা মেয়ে।'

হীরালাল তৎকালে ভগ্নমনোরথ হইয়া ঘরের এদিক-সেদিক দেখিতে লাগিল। চারিদিক দেখিয়া বলিল, 'তোমার ঘরে মদ নাই, বটে হে?' পিতা বিস্মিত হইলেন বলিলেন, 'মদ কীজন্য রাখিব!'

হীরালাল মদ নাই জানিয়া, বিজ্ঞের ন্যায় বলিল, 'সাবধান করিয়া দিবার জন্য বল্‌ছিলাম। এখন ভদ্রলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে চলিলে, ওগুলো যেন না থাকে।'

কথাটা পিতার বড় ভালো লাগিল না। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। হীরালাল না বিবাহে, না মদে, কোনোদিকেই দেশের উন্নতির একজাম্পল সেট্‌ করিতে না পারিয়া, ক্ষুণ্নমনে বিদায় হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহের দিন অতি নিকট হইল—আর একদিনমাত্র বিলম্ব আছে। উপায় নাই! নিষ্কৃতি নাই! চারিদিক হইতে উচ্ছ্বসিত বারিরাশি গর্জিয়া আসিতেছে—নিশ্চিত ডুবিব।

তখন লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, মাতার পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। জোড়হাত করিয়া বলিলাম—'আমার বিবাহ দিও না—আমি আইবুড়ো থাকিব।'

মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন?' কেন? তাহার উত্তর দিতে পারিলাম না। কেবল জোড়হাত করিতে লাগিলাম, কেবল কাঁদিতে লাগিলাম। মাতা বিরক্ত হইলেন—রাগিয়া উঠিলেন; গালি দিলেন। শেষ পিতাকে বলিয়া দিলেন। পিতাও গালি দিয়া মারিতে আসিলেন। আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

উপায় নাই! নিষ্কৃতি নাই! ডুবিলাম।

সেইদিন বৈকালে গৃহে কেবল আমি একা ছিলাম—পিতা বিবাহের খরচসংগ্রহে গিয়াছিলেন—মাতা দ্রব্যসামগ্রী কিনিতে গিয়াছিলেন। এসব যে-সময়ে হয়, সে-সময়ে আমি দ্বার দিয়া থাকিতাম, নাহয় বামাচরণ আমার কাছে বসিয়া থাকিত। বামাচরণ এ দিন বসিয়াছিল। একজন কে দ্বার ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। চেনা পায়ের শব্দ নহে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে গা?'

উত্তর। 'তোমার যম।'

কথা কোপযুক্ত বটে, কিন্তু স্বর স্ত্রীলোকের। ভয় পাইলাম না। হাসিয়া বলিলাম—'আমার যম কি আছে? তবে এতদিন কোথা ছিলে?'

স্ত্রীলোকটির রাগশান্তি হইল না। 'এখন জান্‌বি! বড় বিয়ের সাধ! পোড়ারমুখী;

আবাগী!' ইত্যাদি গালির ছড়া আরম্ভ হইল। গালি সমাপ্তে সেই মধুরভাষিণী বলিলেন, 'হা দেখ, কানী, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়, তবে যেদিন তুই ঘর করিতে যাইবি, সেইদিন তোকে বিষ খাওয়াইয়া মারিব।'

বুঝিলাম, চাঁপা খোদ। আদর করিয়া বসিতে বলিলাম—বলিলাম, 'শুনো—তোমার সঙ্গে কথা আছে।' এত গালির উত্তরে সাদর সম্ভাষণ দেখিয়া, চাঁপা একটু শীতল হইয়া বসিল।

আমি বলিলাম, 'শুনো, এ বিবাহে তুমি যেমন বিরক্ত, আমিও তেমনি। আমার এ বিবাহ যাহাতে না হয়, আমি তাহাই করিতে রাজি আছি। কিসে বিবাহ বন্ধ হয়, তাহার উপায় বলিতে পার?'

চাঁপা বিস্মিত হইল। বলিল, 'তা তোমার বাপ মাকে বলো না কেন?'

আমি বলিলাম, 'হাজার বার বলিয়াছি। কিছু হয় নাই।'

চাঁপা। বাবুদের বাড়ি গিয়া তাঁদের হাতে পায়ে ধরো না কেন?

আমি। তাতেও কিছু হয় নাই।

চাঁপা একটু ভাবিয়া বলিল, 'তবে এক কাজ করিবি?'

আমি। কী?

চাঁপা। দুদিন লুকাইয়া থাকিবি?

আমি। কোথায় লুকাইব? আমার স্থান কোথায় আছে?

চাঁপা আবার একটু ভাবিল। বলিল, 'আমার বাপের বাড়ি গিয়া থাকিবি?'

ভাবিলাম, মন্দ কী? আর তো উদ্ধারের কোনো উপায় দেখি না। বলিলাম, 'আমি কানা, নূতন স্থানে আমাকে কে পথ চিনাইয়া লইয়া যাইবে? তাহারাই বা স্থান দিবে কেন?'

চাঁপা আমার সর্বনাশিনী কুপ্রবৃত্তি মূর্তিমতী হইয়া আসিয়াছিল; সে বলিল, 'তোর তা ভাবিতে হইবে না। সে সব বন্দোবস্ত আমি করিব। আমি সঙ্গে লোক দিব, আমি তাদের বলিয়া পাঠাইব। তুই যাস্ তো বল্?'

মজ্জনোন্মুখের সমীপবর্তী কাষ্ঠফলকবৎ এই প্রবৃত্তি আমার চক্ষে একমাত্র রক্ষার উপায় বলিয়া বোধ হইল। আমি সম্মত হইলাম।

চাঁপা বলিল, 'আচ্ছা, তবে ঠিক থাকিস্। রাত্রে সবাই ঘুমাইলে আমি আসিয়া দ্বারে টোকা মারিব; বাহির হইয়া আসিস্।'

আমি সম্মত হইলাম।

* *

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে দ্বারে ঠকঠক করিয়া অল্প শব্দ হইল। আমি জাগ্রত ছিলাম। দ্বিতীয় বস্ত্র মাত্র লইয়া, আমি দ্বারোদ্ঘাটনপূর্বক বাহির হইলাম। বুঝিলাম, চাঁপা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সঙ্গে চলিলাম। একবার ভাবিলাম না—একবার বুঝিলাম না যে, কী দুষ্কর্ম করিতেছি। পিতা-মাতার জন্য মন কাতর হইল বটে, কিন্তু তখন মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, অল্পদিনের জন্য যাইতেছি। বিবাহের কথা নিবৃত্তি পাইলেই আবার আসিব।

আমি চাঁপার গৃহে—আমার শ্বশুরবাড়ি? উপস্থিত হইলে চাঁপা আমায় সদ্যই লোক সঙ্গে দিয়া বিদায় করিল। পাছে তাহার স্বামী জানিতে পারে, এই ভয়ে বড় তাড়াতাড়ি করিল—যে লোক সঙ্গে দিল, তাহার সঙ্গে যাওয়ার পক্ষে আমার বিশেষ আপত্তি—কিন্তু চাঁপা এমনই তাড়াতাড়ি করিল যে, আমার আপত্তি ভাসিয়া গেল। মনে কর, কাহাকে আমার সঙ্গে দিল? হীরালালকে।

হীরালালের মন্দ চরিত্রের কথা তখন আমি কিছুই জানিতাম না। সেজন্য আপত্তি করি নাই। সে যুবা পুরুষ—আমি যুবতী—তাহার সঙ্গে কী প্রকারে একা যাইব? এই আপত্তি। কিন্তু তখন আমার কথা কে শুনে? আমি অন্ধ, পথ অপরিচিত, রাত্রে আসিয়াছি—সুতরাং পথে যে-সকল শব্দঘটিত চিহ্ন চিনিয়া রাখিয়া আসিয়া থাকি, সে-সকল কিছু শুনিতে পাই নাই—অতএব বিনা সহায়ে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না—বাড়ি ফিরিয়া গেলেও সেই পাপ-বিবাহ! অগত্যা হীরালালের সঙ্গে যাইতে হইল। তখন মনে হইল—আর কেহ অন্ধের সহায় থাক না থাক—মাথার উপর দেবতা আছেন; তাঁহারা কখনও লবঙ্গলতার ন্যায় পীড়িতকে পীড়ন করিবেন না; তাঁহাদের দয়া আছে, শক্তি আছে, অবশ্য দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন—নহিলে দয়া কার জন্য?

তখন জানিতাম না যে, ঐশিক নিয়ম বিচিত্র—মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত—আমরা যাহাকে দয়া বলি, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা দয়া নহে—আমরা যাহাকে পীড়ন বলি—ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা পীড়ন নহে। তখন জানিতাম না যে, এই সংসারের অনন্ত চক্র দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য, সে চক্র নিয়মিত পথে অনতিক্ষুণ্ন রেখায় অহরহ চলিতেছে, তাহার দারুণ বেগের পথে যে পড়িবে—অন্ধ হউক, খঞ্জ হউক, আর্ত হউক, সেই পিষিয়া মরিবে। আমি অন্ধ নিঃসহায় বলিয়া, অনন্ত সংসারচক্র পথ ছাড়িয়া চলিবে কেন?

হীরালালের সঙ্গে প্রশস্ত রাজপথে বাহির হইলাম—তাহার পদশব্দ অনুসরণ করিয়া চলিলাম—কোথাকার ঘড়িতে একটা বাজিল। পথে কেহ নাই—কোথাও শব্দ নাই—দুই-একখানা গাড়ির শব্দ—দুই-একজন সুরাপহৃতবুদ্ধি কামিনীর অসম্বন্ধ গীতিশব্দ! আমি হীরালালকে সহসা জিজ্ঞাসা করিলাম—'হীরালাল বাবু, আপনার গায়ে জোর কেমন?'

হীরালাল একটু বিস্মিত হইল—বলিল, 'কেন?'

আমি বলিলাম, 'জিজ্ঞাসা করি।'

হীরালাল বলিল, 'তা মন্দ নয়।'

আমি। তোমার হাতে কিসের লাঠি?

হীরা। তালের।

আমি। ভাঙিতে পার?

হীরা। সাধ্য কী?

আমি। আমার হাতে দাও দেখি।

হীরালাল আমার হাতে লাঠি দিল। আমি তাহা ভাঙিয়া দ্বিখণ্ড করিলাম।

হীরালাল আমার বল দেখিয়া বিস্মিত হইল। আমি আধখানা তাহাকে দিয়া, আধখানা আপনি রাখিলাম। তাহার লাঠি ভাঙিয়া দিলাম দেখিয়া হীরালাল রাগ করিল। আমি বলিলাম—'আমি এখন নিশ্চিন্ত হইলাম—রাগ করিও না। তুমি আমার বল দেখিলে—আমার হাতে এই আধখানা ল্যাঠি দেখিলে—তোমার ইচ্ছা থাকিলেও তুমি আমার উপর কোনো অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না।'

হীরালাল চুপ করিয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হীরালাল, জগন্নাথের ঘাটে গিয়া নৌকা করিল। রাত্রিকালে দক্ষিণা বাতাসে পাল দিল। সে বলিল, তাহাদের পিত্রালয় হুগলি। আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

পথে হীরালাল বলিল, 'গোপালের সঙ্গে তোমার বিবাহ তো হইবে না—আমায় বিবাহ কর।' আমি বলিলাম 'না।' হীরালাল বিচার আরম্ভ করিল। তাহার যত্ন যে, বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন করে যে, তাহার ন্যায় সৎপাত্র পৃথিবীতে দুর্লভ; আমার ন্যায় কুপাত্রীও পৃথিবীতে দুর্লভ। আমি উভয়ই স্বীকার করিলাম—তথাপি বলিলাম যে, 'না, তোমাকে বিবাহ করিব না।'

তখন হীরালাল বড় ক্রুদ্ধ হইল। বলিল, 'কানাকে কে বিবাহ করিতে চাহে?' এই বলিয়া নীরব হইল। উভয়ে নীরব রহিলাম—এইরূপে রাত্রি কাটিতে লাগিল।

তাহার পরে, শেষরাত্রে হীরালাল অকস্মাৎ মাঝিদিগকে বলিল, 'এইখানে ভিড়ো।' মাঝিরা নৌকা লাগাইল—নৌকাতলে ভূমি স্পর্শের শব্দ শুনিলাম। হীরালাল আমাকে বলিল, 'নামো—আসিয়াছি।'—সে আমার হাত ধরিয়া নামাইল। আমি কূলে দাঁড়াইলাম।

তাহার পর শব্দ শুনিলাম, যেন হীরালাল আবার নৌকায় উঠিল। মাঝিদিগকে বলিল, 'দে, নৌকা খুলিয়া দে।' আমি বলিলাম, 'সে কী! আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা খুলিয়া দাও কেন?'

হীরালাল বলিল, 'আপনার পথ আপনি দেখ।' মাঝিরা নৌকা খুলিতে লাগিল—দাঁড়ের শব্দ শুনিলাম। আমি তখন কাতর হইয়া বলিলাম, 'তোমার পায়ে পড়ি! আমি অন্ধ—যদি একান্তই আমাকে ফেলিয়া যাইবে, তবে কাহারও বাড়ি পর্যন্ত আমাকে রাখিয়া যাও। আমি তো এখানে কখনও আসি নাই—এখানকার পথ চিনিব কী প্রকারে?'

হীরালাল বলিল, 'আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ?'

আমার কান্না আসিল। ক্ষণেক রোদন করিলাম। রাগে হীরালালকে বলিলাম, 'তুমি যাও। তোমার কাছে কোনো উপকারও পাইতে নাই—রাত্রি প্রভাত হইলে তোমার অপেক্ষা দয়ালু শত শত লোকের সাক্ষাৎ পাইব। তাহারা অন্ধের প্রতি তোমার অপেক্ষা দয়া করিবে।'

হী। দেখা পেলে তো! এ যে চড়া! চারিদিকে জল। আমাকে বিবাহ করিবে?

হীরালালের নৌকা তখন কিছু বাহিরে গিয়াছিল। শ্রবণশক্তি আমার জীবনাবলম্বন—শ্রবণই আমার চক্ষের কাজ করে। কেহ কথা কহিলে—কত দূরে, কোন্ দিকে কথা কহিতেছে, তাহা অনুভব করিতে পারি। হীরালাল কোন্ দিকে, কত দূরে থাকিয়া কথা কহিল, তাহা মনে মনে অনুভব করিয়া, জলে নামিয়া সেই দিকে ছুটিলাম—ইচ্ছা, নৌকা ধরিব। গলাজল অবধি নামিলাম। নৌকা পাইলাম না। নৌকা আরও বেশি জলে। নৌকা ধরিতে গেলে ডুবিয়া মরিব।

তালের লাঠি তখনও হাতে ছিল। আবার ঠিক করিয়া শব্দানুভব করিয়া বুঝিলাম, হীরালাল এই দিকে, এত দূর হইতে কথা কহিতেছে। পিছু হটিয়া কোমর জলে উঠিয়া, শব্দের স্থানানুভব করিয়া, সবলে সেই তালের লাঠি নিক্ষেপ করিলাম।

চীৎকার করিয়া হীরালাল নৌকার উপর পড়িয়া গেল। 'খুন হইয়াছে, খুন হইয়াছে।' বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। বাস্তবিক—সেই পাপিষ্ঠ খুন হয় নাই। তখনই তাহার মধুর কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম—নৌকা বাহিয়া চলিল—সে উচ্চৈঃস্বরে আমাকে গালি দিতে দিতে চলিল—অতি কদর্য অশ্রাব্য ভাষায় পবিত্রা গঙ্গা কলুষিত করিতে করিতে চলিল। আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম যে, সে শাসাইতে লাগিল যে, আবার খবরের কাগজ করিয়া আমার নামে আর্টিকেল লিখিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সেই জনহীনা রাত্রিতে, আমি অন্ধ যুবতী, একা সেই দ্বীপে দাঁড়াইয়া গঙ্গার কলকল জলকল্লোল শুনিতে লাগিলাম।

হায়, মানুষের জীবন! কী অসার তুই! কেন আসিস্—কেন থাকিস্—কেন যাস্? এ দুঃখময় জীবন কেন? ভাবিলে জ্ঞান থাকে না। শচীন্দ্রবাবু, একদিন তাঁহার মাতাকে বুঝাইতেছিলেন, সকলই নিয়মাধীন। মানুষের এই জীবন কি কেবল সেই নিয়মের ফল? যে নিয়মে ফুল ফুটে, মেঘ ছুটে, চাঁদ উঠে—যে নিয়মে জলবুদ্‌বুদ্ ভাসে, হাসে, মিলায়; যে নিয়মে ধূলা উড়ে, তৃণ পুড়ে, পাতা খসে—সেই নিয়মেই কি এই সুখদুঃখময় মনুষ্যজীবন আবদ্ধ, সম্পূর্ণ, বিলীন হয়? যে নিয়মের অধীন হইয়া ঐ নদীগর্ভস্থ কুম্ভীর শিকারের সন্ধান করিতেছে—যে নিয়মের অধীন হইয়া এই চরে ক্ষুদ্র কীটসকল অন্য কীটের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, সেই নিয়মের অধীন হইয়া আমি শচীন্দ্রের জন্য প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছি? ধিক্ প্রাণত্যাগে! ধিক্ প্রণয়ে! ধিক্ মনুষ্যজীবনে! কেন এই গঙ্গাজলে ইহা পরিত্যাগ করি না?

জীবন অসার—সুখ নাই বলিয়া অসার, তাহা নহে। শিমুলগাছে শিমুলফুলই ফুটিবে; তাহা বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। দুঃখময় জীবনে দুঃখ আছে বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। কিন্তু অসার বলি এইজন্য যে, দুঃখই দুঃখের পরিণাম—তাহার পর আর কিছু নাই। আমার মর্মের দুঃখ, আমি একা ভোগ করিলাম, আর কেহ জানিল না—আর কেহ বুঝিল না—দুঃখ প্রকাশের ভাষা নাই

বলিয়া তাহা বলিতে পারিলাম না; শ্রোতা নাই বলিয়া তাহা শুনাইতে পারিলাম না—সহৃদয় বোদ্ধা নাই বলিয়া তাহা বুঝাইতে পারিলাম না। একটি শিমুলবৃক্ষ হইতে সহস্র শিমুলবৃক্ষ হইতে পারিবে, কিন্তু তোমার দুঃখে আর কয়জনের দুঃখ হইবে। পরের অন্তঃকরণমধ্যে পরে প্রবেশ করিতে পারে, এমন কয়জন পর পৃথিবীতে জন্মিয়াছে? পৃথিবীতে কে এমন জন্মিয়াছে যে, অন্ধ পুষ্পনারীর দুঃখ বুঝিবে? কে এমন জন্মিয়াছে যে, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে, প্রতি কথায়, প্রতি শব্দে, প্রতি বর্ণে, কত সুখদুঃখের তরঙ্গ উঠে, তাহা বুঝিতে পারে? সুখ দুঃখ? হাঁ, সুখও আছে। যখন চৈত্র মাসে, ফুলের বোঝার সঙ্গে সঙ্গে মৌমাছি ছুটিয়া আমাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিত, তখন সে-শব্দের সঙ্গে আমার কত সুখ উছলিত, কে বুঝিত? যখন গীতিব্যবসায়িনীর অট্টালিকা হইতে বাদ্যনিক্বণ, সান্ধ্য-সমীরণে কর্ণে আসিত, তখন আমার সুখ কে বুঝিয়াছে? যখন বামাচরণের আধো-আধো কথা ফুটিয়াছিল—জল বলিতে 'ত' বলিত, কাপড় বলিতে 'খাব' বলিত, রজনী বলিতে 'জুজ্জি' বলিত; তখন আমার মনে কত সুখ উছলিত, তাহা কে বুঝিয়াছিল? আমার দুঃখই বা কে বুঝিবে? অন্ধের রূপোন্মাদ কে বুঝিবে? না-দেখায় যে-দুঃখ, তাহা কে বুঝিবে? বুঝিলেও বুঝিতে পারে, কিন্তু দুঃখ-যে কখনো প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এ দুঃখ কে বুঝিবে? পৃথিবীতে যে-দুঃখের ভাষা নাই, এ দুঃখ কে বুঝিবে? ছোট মুখে বড় কথা তোমরা ভালোবাস না, ছোট ভাষায় বড় দুঃখ কি প্রকাশ করা যায়? এমনই দুঃখ যে, আমার যে কী দুঃখ, তাহাতে হৃদয় ধ্বংস হইলেও, সকলটা আপনি মনে ভাবিয়া আনিতে পারি না।

মনুষ্যভাষাতে তেমন কথা নাই—মনুষ্যের তেমন চিন্তাশক্তি নাই। দুঃখ ভোগ করি—কিন্তু দুঃখটা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমার কী দুঃখ? কী তাহা জানি না, কিন্তু হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। সর্বদা দেখিতে পাইবে যে, তোমার দেহ শীর্ণ হইতেছে, বল অপহৃত হইতেছে, কিন্তু তোমার শারীরিক রোগ কী, তাহা জানিতে পারিতেছ না। তেমনি অনেক সময় দেখিবে যে, দুঃখে তোমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে, প্রাণ বাহির করিয়া দিয়া শূন্যমার্গে পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেছে—কিন্তু কী দুঃখ, তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছ না। আপনি বুঝিতে পারিতেছ না—পরে বুঝিবে কি? ইহা কি সামান্য দুঃখ? সাধ করিয়া বলি, জীবন অসার!

যে জীবন এমন দুঃখময়, তাহার রক্ষার জন্য এত ভয় পাইতেছিলাম কেন? আমি কেন ইহা ত্যাগ করি না? এই তো কলনাদিনী গঙ্গার তরঙ্গমধ্যে দাঁড়াইয়া আছি—আর দুই পা অগ্রসর হইলেই মরিতে পারি। না মরি কেন? এ জীবন রাখিয়া কী হইবে? মরিব!

আমি কেন জন্মিলাম? কেন অন্ধ হইলাম? জন্মিলাম তো শচীন্দ্রের যোগ্য হইয়া জন্মিলাম না কেন? শচীন্দ্রের যোগ্য না হইলাম, তবে শচীন্দ্রকে ভালোবাসিলাম কেন? ভালোবাসিলাম, তবে তাঁহার কাছে রহিতে পারিলাম না কেন? কিসের জন্য শচীন্দ্রকে ভাবিয়া, গৃহত্যাগ করিতে হইল? নিঃসহায় অন্ধ, গঙ্গার চরে মরিতে আসিলাম কেন? কেন বানের মুখে কুটার মতো, সংসারস্রোতে, অজ্ঞাত পথে

ভাসিয়া চলিলাম? এ সংসারে অনেক দুঃখী আছে, আমি সর্বাপেক্ষা দুঃখী কেন? এ সকল কাহার খেলা? দেবতার? জীবের এত কষ্টে দেবতার কী সুখ? কষ্ট দিবার জন্য সৃষ্টি করিয়া কী সুখ? মূর্তিমতী নির্দয়তাকে কেন দেবতা বলিব? কেন নিষ্ঠুরতার পূজা করিব? মানুষের এত ভয়ানক দুঃখ কখনো দেবকৃত নহে—তাহা হইলে দেবতা রাক্ষসের অপেক্ষা সহস্রগুণে নিকৃষ্ট। তবে কি আমার কর্মফল? কোন্ পাপে আমি জন্মান্ধ?

দুই-এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম—মরিব! গঙ্গার তরঙ্গরব কানে বাজিতে লাগিল—বুঝি মরা হইল না—আমি মিষ্ট শব্দ বড় ভালোবাসি! না, মরিব। চিবুক ডুবিল! অধর ডুবিল! আর একটু মাত্র। নাসিকা ডুবিল! চক্ষু ডুবিল! আমি ডুবিলাম!

ডুবিলাম, কিন্তু মরিলাম না। কিন্তু এ যন্ত্রণাময় জীবনচরিত আর বলিতে সাধ করে না। আর একজন বলিবে।

আমি সেই প্রভাতবায়ুতাড়িত গঙ্গাজলপ্রবাহমধ্যে নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। ক্রমে শ্বাস নিশ্চেষ্ট, চেতনা বিনষ্ট হইয়া আসিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

অমরনাথের কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার এই অসার জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনী লিখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ সংসারসাগরে, কোন্ চরে লাগিয়া আমার এই নৌকা ভাঙিয়াছে, তাহা এই বিশ্বচিত্রে আমি আঁকিয়া রাখিব; দেখিয়া নবীন নাবিকেরা সতর্ক হইতে পারিবে।

আমার নিবাস—অথবা পিত্রালয় শান্তিপুর—আমার বর্তমান বাসস্থানের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। আমি সৎকায়স্থকুলোদ্ভূত, কিন্তু আমার পিতৃকুলে একটি গুরুতর কলঙ্ক ঘটিয়াছিল। আমার খুল্লতাতপত্নী কুলত্যাগিনী হইয়াছিলেন। আমার পিতার ভূসম্পত্তি যাহা ছিল—তদ্দ্বারা অন্য উপায় অবলম্বন না করিয়াও সংসারযাত্রা নির্বাহ করা যায়। লোকে তাঁহাকে ধনী বলিয়া গণনা করিত। তিনি আমার শিক্ষার্থ অনেক ধন ব্যয় করিয়াছিলেন। আমিও কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম—কিন্তু সে-কথায় কাজ নাই। সর্পের মণি থাকে; আমারও বিদ্যা ছিল।

আমার বিবাহযোগ্য বয়স উপস্থিত হইলে আমার অনেক সম্বন্ধ আসিল—কিন্তু কোনো সম্বন্ধই পিতার মনোমতো হইল না। তাঁহার ইচ্ছা, কন্যা পরম সুন্দরী হইবে, কন্যার পিতা পরম ধনী হইবে এবং কৌলীন্যের নিয়ম-সকল বজায় থাকিবে। কিন্তু এরূপ কোনো সম্বন্ধ উপস্থিত হইল না। আসল কথা, আমাদিগের কুলকলঙ্ক শুনিয়া কোনো বড়লোক আমাকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছুক হয়েন নাই। এইরূপ সম্বন্ধ করিতে করিতে আমার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল।

পরিশেষে পিতার স্বর্গারোহণের পর আমার এক পিসি এক সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন। গঙ্গাপার, কালিকাপুর নামে এক গ্রাম ছিল। এই ইতিহাসে ভবানীনগর নামে অন্য গ্রামের নাম উত্থাপিত হইবে; এই কালিকাপুর সেই ভবানীনগরের নিকটস্থ গ্রাম। আমার পিসির শ্বশুরালয় সেই কালিকাপুরে। সেইখানে লবঙ্গ নামে কোনো ভদ্রলোকের কন্যার সঙ্গে পিসি আমার সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন।

সম্বন্ধের পূর্বে আমি লবঙ্গকে সর্বদাই দেখিতে পাইতাম। আমার পিসির বাড়িতে আমি মধ্যে মধ্যে যাইতাম। লবঙ্গকে পিসির বাড়িতেও দেখিতাম—তাহার পিত্রালয়েও দেখিতাম। মধ্যে মধ্যে লবঙ্গকে শিশুবোধ হইতে 'ক'য়ে করাত, 'খ'য়ে

খরা শিখাইতাম। যখন তাহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হইল, তখন হইতে সে আমার কাছে আর আসিত না। কিন্তু সেই সময়েই আমিও তাহারে দেখিবার জন্য অধিকতর উৎসুক হইয়া উঠিলাম। তখন লবঙ্গের বিবাহের বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছিল—লবঙ্গ কলিকা ফোট ফোট হইয়াছিল। চক্ষের চাহনি চঞ্চল অথচ ভীত হইয়া আসিয়াছিল—উচ্চহাস্য মৃদু এবং ব্রীড়াযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—দ্রুতগতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিতাম, এমন সৌন্দর্য কখনো দেখি নাই—এ সৌন্দর্য যুবতীর অদৃষ্টে কখনো ঘটে না। বস্তুত অতীতশৈশব অথচ অপ্রাপ্তযৌবনার সৌন্দর্য এবং অস্ফুটবাক্ শিশুর সৌন্দর্য, ইহাই মনোহর—যৌবনের সৌন্দর্য তাদৃশ নহে। যৌবনে বসনভূষণের ঘটা, হাসি চাহনির ঘটা,—বেণীর দোলনি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি—যুবতীর রূপের বিকাশ একপ্রকার দোকানদারি। আর আমরা যে-চক্ষে সে-সৌন্দর্য দেখি, তাহাও বিকৃত। যে-সৌন্দর্যের উপভোগে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শ মাত্র নাই, সেই সৌন্দর্যই সৌন্দর্য।

এই সময়ে আমাদের কুলকলঙ্ক কন্যাকর্তার কর্ণে প্রবেশ করিল—সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেল। আমার হৃদয়পতত্রী সবে এই লবঙ্গলতায় বসিতেছিল—এমত সময় ভবানীনগরের রামসদয় মিত্র আসিয়া লবঙ্গলতা ছিঁড়িয়া লইয়া গেল। তাহার সঙ্গে লবঙ্গলতার বিবাহ হইল। লবঙ্গলাভে নিরাশ হইয়া আমি বড় ক্ষুণ্ন হইলাম।

ইহার কয় বৎসর পরে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যে, তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। পশ্চাৎ বলিব কি না, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছি না। সেই অবধি আমি গৃহত্যাগ করিলাম। সেই পর্যন্ত নানাদেশে ভ্রমণ করিয়াই বেড়াই। কোথাও স্থায়ী হইতে পারি নাই।

কোথাও স্থায়ী হই নাই, কিন্তু মনে করিলেই স্থায়ী হইতে পারিতাম। মনে করিলে কুলীন ব্রাহ্মণের অপেক্ষা অধিক বিবাহ করিতে পারিতাম। আমার সব ছিল—ধন, সম্পদ, বয়স, বিদ্যা, বাহুবল—কিছুরই অভাব ছিল না; অদৃষ্টদোষে, একদিনের দুর্বুদ্ধিদোষে, সকল ত্যাগ করিয়া, আমি এই সুখময় গৃহ—এই উদ্যানতুল্য পুষ্পময় সংসার ত্যাগ করিয়া, বাত্যাতাড়িত পতঙ্গের মতো দেশে দেশে বেড়াইলাম। আমি মনে করিলে আমার সেই জন্মভূমিতে রম্যগৃহ রম্যসজ্জায় সাজাইয়া, রঙ্গের পবনে সুখের নিশান উড়াইয়া দিয়া, হাসির বাণে দুঃখরাক্ষসকে বধ করিতে পারিতাম। কিন্তু—

এখন তাই ভাবি, কেন করিলাম না। সুখদুঃখের বিধান পরের হাতে, কিন্তু মন তো আমার। তরঙ্গ নৌকা ডুবিল বলিয়া, কেন ডুবিয়া রহিলাম—সাঁতার দিয়া তো কূল পাওয়া যায়। আর দুঃখ—দুঃখ কী? মনের অবস্থা, সে তো নিজের আয়ত্ত। সুখদুঃখ পরের হাত, না আমার নিজের হাত? পর কেবল বহির্জগতের কর্তা—অন্তর্জগতে আমি একা কর্তা। আমার রাজ্য লইয়া আমি সুখী হইতে পারি না কেন? জড়জগৎ জগৎ, অন্তর্জগৎ কি জগৎ নয়? আপনার মন লইয়া কি থাকা যায় না? তোমার বাহ্যজগতে কয়টি সামগ্রী আছে, আমার অন্তরে কী বা নাই?

আমার অন্তরে যাহা আছে, তাহা তোমার বাহ্যজগৎ দেখাইবে, সাধ্য কী? যে কুসুম এ মৃত্তিকায় ফুটে, যে বায়ু এ আকাশে বয়, যে চাঁদ এ গগনে উঠে, যে সাগর এ অন্ধকারে আপনি মাতে—তোমার বাহ্যজগতে তেমন কোথায়?

তবে কেন, সেই নিশীথকালে, সুষুপ্তা সুন্দরীর সৌন্দর্যপ্রভা—দূর হৌক! একদিন নিশীথকালে—এই অসীম পৃথিবী সহসা আমার চক্ষে শুষ্ক বদরীর মতো ক্ষুদ্র হইয়া গেল—আমি লুকাইবার স্থান পাইলাম না। দেশে দেশে ফিরিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কালের শীতল প্রলেপে সেই হৃদয়ক্ষত ক্রমে পুরিয়া উঠিতে লাগিল।

কাশীধামে গোবিন্দকান্ত দত্ত নামে কোনো সচ্চরিত্র, অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ হইল। ইনি বহুকাল হইতে কাশীবাস করিয়া আছেন।

একদা তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনকালে পুলিশের অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত হইল। অনেকে পুলিশের অত্যাচারঘটিত অনেকগুলিন গল্প বলিলেন—দুই-একটা বা সত্য, দুই-একটা বক্তাদিগের কপোলকল্পিত। গোবিন্দকান্ত বাবু একটি গল্প বলিলেন, তাহার সারমর্ম এই—

"হরেকৃষ্ণ দাস নামে আমাদিগের গ্রামে একঘর দরিদ্র কায়স্থ ছিল। তাহার একটি কন্যা ভিন্ন অন্য সন্তান ছিল না। তাহার গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছিল, এবং সে নিজেও রুগ্‌ণ। এজন্য সে কন্যাটি আপন শ্যালীপতিকে প্রতিপালন করিতে দিয়াছিল। তাহার কন্যাটির কতকগুলিন স্বর্ণালঙ্কার ছিল। লোভবশত তাহা সে শ্যালীপতিকে দেয় নাই। কিন্তু যখন মৃত্যু উপস্থিত দেখিল, তখন সেই অলঙ্কারগুলি সে আমাকে ডাকিয়া আমার কাছে রাখিল—বলিল যে, 'আমার কন্যার জ্ঞান হইলে তাহাকে দিবেন—এখন দিলে রাজচন্দ্র ইহা আত্মসাৎ করিবে।' আমি স্বীকৃত হইলাম। পরে হরেকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে সে লাওয়ারেশ মরিয়াছে বলিয়া, নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেব দারোগা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরেকৃষ্ণের ঘটী বাটী পাতর টুকনি লাওয়ারেশ মাল বলিয়া হস্তগত করিলেন। কেহ কেহ বলিল যে, হরেকৃষ্ণ লাওয়ারেশ নহে—কলিকাতায় তাহার কন্যা আছে। দারোগা মহাশয় তাহাকে কটু বলিয়া, আজ্ঞা করিলেন, 'ওয়ারেশ থাকে, হুজুরে হাজির হইবে।' তখন আমার দুই-একজন শত্রু সুযোগ মনে করিয়া বলিয়া দিল যে, গোবিন্দ দত্তের কাছে ইহার স্বর্ণালঙ্কার আছে। আমাকে তলব হইল। আমি তখন দেবাদিদেবের কাছে আসিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইলাম। কিছু গালি খাইলাম। আসামির শ্রেণীতে চালান হইবার গতিক দেখিলাম। বলিব কী? ঘুসাঘুসির উদ্যোগ দেখিয়া অলঙ্কারগুলি সকল দারোগা মহাশয়ের পাদপদ্মে ঢালিয়া দিলাম, তাহার উপর পঞ্চাশ টাকা নগদ দিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম।

"বলাবাহুল্য যে, দারোগা মহাশয় অলঙ্কারগুলি আপন কন্যার ব্যবহারার্থ নিজালয়ে প্রেরণ করিলেন। সাহেবের কাছে তিনি রিপোর্ট করিলেন যে, 'হরেকৃষ্ণ

দাসের এক লোটা আর এক দেরকো ভিন্ন অন্য কোনো সম্পত্তিই নাই; এবং সে লাওয়ারেশা ফৌত করিয়াছে, তাহার কেহ নাই'।"

হরেকৃষ্ণ দাসের নাম শুনিয়াছিলাম। আমি গোবিন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 'ঐ হরেকৃষ্ণ দাসের এক ভাইয়ের নাম মনোহর দাস না?'

গোবিন্দকান্তবাবু বলিলেন, 'হাঁ। আপনি কী প্রকারে জানিলেন?'

আমি বিশেষ কিছু বলিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হরেকৃষ্ণের শ্যালীপতির নাম কী?'

গোবিন্দবাবু বলিলেন, 'রাজচন্দ্র দাস।'

আমি। তাহার বাড়ি কোথায়?

গোবিন্দবাবু বলিলেন, 'কলিকাতায়। কিন্তু কোন্ স্থানে তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সে-কন্যাটির নাম কী জানেন?'

গোবিন্দবাবু বলিলেন, 'হরেকৃষ্ণ তাহার নাম রজনী রাখিয়াছিলেন।'

ইহার অল্পদিন পরেই আমি কাশী পরিত্যাগ করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমে আমাকে বুঝিতে হইতেছে, আমি কী খুঁজি। চিত্ত আমার দুঃখময়, এ সংসার আমার পক্ষে অন্ধকার। আজি আমার মৃত্যু হইলে, আমি কাল চাহি না। যদি দুঃখ নিবারণ করিতে না পারিলাম, তবে পুরুষত্ব কী? কিন্তু ব্যাধির শান্তি করিতে গেলে আগে ব্যাধির নির্ণয় চাহি। দুঃখ নিবারণের আগে আমার দুঃখ কী, তাহা নিরূপণের আবশ্যক।

দুঃখ কী? অভাব। সকল দুঃখই অভাব। রোগ দুঃখ; কারণ, রোগ স্বাস্থ্যের অভাব। অভাবমাত্রই দুঃখ নহে, তাহা জানি। রোগের অভাব দুঃখ নহে। অভাববিশেষই দুঃখ।

আমার কিসের অভাব? আমি চাই কী? মনুষ্যই চায় কী? ধন? আমার যথেষ্ট আছে।

যশ? পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যাহার যশ নাই। যে পাকা জুয়াচোর, তাহারও বুদ্ধি সম্বন্ধে যশ আছে। আমি একজন কসাইয়ের যশ শুনিয়াছি—মাংস সম্বন্ধে সে কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিত না। সে কখনো মেষমাংস বলিয়া কাহাকেও কুক্কুরমাংস দেয় নাই। যশ সকলেরই আছে। আবার কাহারও যশ সম্পূর্ণ নহে। বেকনের ঘুসখোর অপবাদ—সক্রেতিস্ অপযশহেতু বধদণ্ডার্হ হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির দ্রোণবধে মিথ্যাবাদী—অর্জুন বভ্রুবাহন কর্তৃক পরাভূত। কাইসরকে যে বিথীনিয়ার রানী বলিত, সে-কথা অদ্যাপি প্রচলিত;—শেক্স্পিয়রকে বল্টের ভাঁড় বলিয়াছেন। যশ চাহি না।

যশ সাধারণ লোকের মুখে। সাধারণ লোক কোনো বিষয়েই বিচারক নহে—কেননা, সাধারণ লোক মূর্খ এবং স্থূলবুদ্ধির কাছে যশস্বী হইয়া আমার কী সুখ হইবে? আমি যশ চাহি না।

মান? সংসারে এমন লোক কে আছে যে, সে মানিলে সুখী হই? যে দুই-চারি জন আছে, তাহাদিগের কাছে আমার মান আছে। অন্যের কাছে মান—অপমান মাত্র। রাজদরবারে মান—সে কেবল দাসত্বের প্রাধান্যচিহ্ন বলিয়া আমি অগ্রাহ্য করি। আমি মান চাহি না। মান চাহি কেবল আপনার কাছে।

রূপ? কতটুকু চাই? কিছু চাই। লোকে দেখিয়া, না নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে। আমাকে দেখিয়া কেহ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে না। রূপ যাহা আছে, তাহাই আমার যথেষ্ট।

স্বাস্থ্য? আমার স্বাস্থ্য অদ্যাপি অনন্ত।

বল? লইয়া কী করিব? প্রহারের জন্য বল আবশ্যক। আমি কাহাকেও প্রহার করিতে চাহি না।

বুদ্ধি? এ সংসারে কেহ কখনো বুদ্ধির অভাব আছে মনে করে নাই—আমিও করি না। সকলেই আপনাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলিয়া জানে, আমিও জানি।

বিদ্যা? ইহার অভাব স্বীকার করি, কিন্তু কেহ কখনো বিদ্যার অভাবে আপনাকে অসুখী মনে করে নাই। আমিও করি না।

ধর্ম? লোকে বলে, ধর্মের অভাব পরকালের দুঃখের কারণ, ইহকালের নহে। লোকের চরিত্রে দেখিতে পাই, অধর্মের অভাবই দুঃখ। জানি আমি, সে মিথ্যা। কিন্তু জানিয়াও ধর্মকামনা করি না। আমার সে দুঃখ নহে।

প্রণয়? স্নেহ? ভালোবাসা? আমি জানি, ইহার অভাবই সুখ—ভালোবাসাই দুঃখ। সাক্ষী লবঙ্গলতা।

তবে আমার দুঃখ কিসের? আমার অভাব কিসের? আমার কিসের কামনা যে, তাহা লাভে সফল হইয়া দুঃখ নিবারণ করিব? আমার কাম্যবস্তু কী?

বুঝিয়াছি। আমার কাম্যবস্তুর অভাবই আমার দুঃখ। আমি বুঝিয়াছি যে, সকলই অসার। তাই আমার কেবল দুঃখ সার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিছু কাম্য কি খুঁজিয়া পাই না? এই অনন্ত সংসার, অসংখ্য রত্নরাজিময়, ইহাতে আমার প্রার্থনীয় কি কিছু নাই? যে-সংসারে এক-একটি দূরবেক্ষণীয় ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ অনন্ত কৌশলের স্থান, অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, যে-জগতে পথিস্থ বালুকার এক-এক কণা, অনন্তরত্নপ্রভব নগাধিরাজের ভগ্নাংশ, সে-জগতে কি আমার কাম্যবস্তু কিছু নাই। দেখ, আমি কোন্ ছার!

টিন্ডল, হক্সলি, ডার্বিন, এবং লায়ল এক আসনে বসিয়া যাবজ্জীবনে ঐ ক্ষুদ্র নীহারবিন্দুর, ঐ বালুকাকণার বা ঐ শিয়ালকাঁটাফুলটির গুণ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন না—তবু আমার কাম্যবস্তু নাই? আমি কী?

দেখ, এই পৃথিবীতে কত কোটি মনুষ্য আছে, তাহা কেহ গণিয়া সংখ্যা করে নাই। বহু কোটি মনুষ্য সন্দেহ নাই—উহার এক-একটি মনুষ্য অসংখ্য গুণের

আধার। সকলেই ভক্তি, প্রীতি, দয়া, ধর্মাদির আধার—সকলেই পূজ্য, সকলেই অনুসরণীয়। আমার কাম্য কি কেহ নাই? আমি কী?

আমার এই বাঞ্ছনীয় পদার্থ ছিল—আজিও আছে। কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। পূর্ণ হইবার নহে বলিয়া তাহা হৃদয় হইতে অনেকদিন হইল উন্মূলিত করিয়াছি। আর পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহি না। অন্য কোনো বাঞ্ছনীয় কি সংসারে নাই?

তাই খুঁজি। কী করিব?

কয় বৎসর হইতে আমি আপনাআপনি এই প্রশ্ন করিতেছিলাম, উত্তর দিতে পারিতেছিলাম না। যে দুই-একজন বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—তোমার আপনার কাজ না থাকে, পরের কাজ কর। লোকের যথাসাধ্য উপকার কর।

সে তো প্রাচীন কথা। লোকের উপকার কিসে হয়? রামের মার ছেলের জ্বর হইয়াছে, নাড়ি টিপিয়া একটু কুইনাইন দাও। রঘো পাগলের গাত্রবস্ত্র নাই, কম্বল কিনিয়া দাও। সন্তার মা বিধবা, মাসিক দাও। সুন্দর নাপিতের ছেলে ইস্কুলে পড়িতে পায় না—তাহার বেতনের আনুকূল্য কর। এই কি পরের উপকার?

মানিলাম, এই পরের উপকার। কিন্তু এ-সকলে কতক্ষণ যায়? কতটুকু সময় কাটে? কতটুকু পরিশ্রম হয়? মানসিক শক্তিসকল কতখানি উত্তেজিত হয়? আমি এমত বলি না যে, ঐসকল কার্য আমার যথাসাধ্য আমি করিয়া থাকি; কিন্তু যতটুকু করি, তাহাতে আমার বোধ হয় না যে, ইহাতে আমার অভাব পূরণ হইবে। আমার যোগ্য কাজ আমি খুঁজি, যাহাতে আমার মন মজিবে, তাই খুঁজি।

আর-একপ্রকারের লোকের উপকারের ঢং উঠিয়াছে। তাহার এককথায় নাম দিতে হইলে বলিতে হয় 'বকাবকি লেখালেখি'। সোসাইটি, ক্লাব, এসোসিয়েশন, সভা, সমাজ, বক্তৃতা, রিজলিউশ্যন, আবেদন, নিবেদন, সমবেদন,—আমি তাহাতে নহি। আমি একদা কোনো বন্ধুকে একটি মহাসভার ঐরূপ একখানি আবেদন পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কী পড়িতেছ? তিনি বলিলেন, 'এমন কিছু না, কেবল কানা ফকির ভিক মাঙ্গে।' এ সকল আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে তাই—কেবল 'কানা ফকির ভিক মাঙ্গে রে বাবা।'

এই রোগের আর-একপ্রকার বিকার আছে। বিধবার বিবাহ দাও, কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহ বন্ধ কর, অল্পবয়সে বিবাহ বন্ধ কর, জাতি উঠাইয়া দেও, স্ত্রীলোকগণ এক্ষণে গোরুর মতো গোহালে বাঁধা থাকে—দড়ি খুলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, চরিয়া খাক্। আমার গোরু নাই, পরের গোহালের সঙ্গেও আমার বিশেষ সম্বন্ধ নাই। জাতি উঠাইতে আমি বড় রাজি নহি, আমি ততদূর আজিও সুশিক্ষিত হই নাই। আমি এখনও আমার ঝাড়ুদারের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাইতে অনিচ্ছুক, তাহার কন্যা বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, এবং যে গালি শিরোমণি মহাশয় দিলে নিঃশব্দে সহিব, ঝাড়ুদারের কাছে তাহা সহিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং আমার জাতি থাকুক। বিধবা বিবাহ করে করুক, ছেলেপুলেরা আইবুড়ো থাকে থাকুক, কুলীন ব্রাহ্মণ এক পত্নীর যন্ত্রণায় খুশি হয় হউক, আমার আপত্তি নাই; কিন্তু তাহার

পোষকতায় লোকের কী হিত হইবে, তাহা আমার বুদ্ধির অতীত।

সুতরাং এ বঙ্গসমাজে আমার কোনো কার্য নাই। এখানে আমি কেহ নহি—আমি কোথাও নহি। আমি, আমি, এই পর্যন্ত; আর কিছু নহি। আমার সেই দুঃখ। আর কিছু দুঃখ নাই—লবঙ্গলতার হস্তলিপি ভুলিয়া যাইতেছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমার এইরূপ মনের অবস্থা, আমি এমত সময়ে—কাশীধামে গোবিন্দ দত্তের কাছে রজনীর নাম শুনিলাম। মনে হইল, ঈশ্বর আমাকে, বুঝি একটি গুরুতর কার্যের ভার দিলেন। এ সংসারে আমি একটি কার্য পাইলাম। রজনীর যথার্থ উপকার চেষ্টা করিলে করা যায়। আমার তো কোনো কাজ নাই—এই কাজ কেন করি না। ইহা কি আমার যোগ্য কাজ নহে?

এখানে শচীন্দ্রের বংশাবলির পরিচয় কিছু দিতে হইল। শচীন্দ্রনাথের পিতার নাম রামসদয় মিত্র; পিতামহের নাম বাঞ্ছারাম মিত্র; প্রপিতামহের নাম কেবলরাম মিত্র। তাঁহাদিগের পূর্বপুরুষের বাস কলিকাতায় নহে—তাঁহার পিতা প্রথমে কলিকাতায় বাস করেন। তাঁহাদিগের পূর্বপুরুষের বাস ভবানীনগর গ্রামে। তাঁহার প্রপিতামহ দরিদ্র নিঃস্ব ব্যক্তি ছিলেন। পিতামহ, বুদ্ধিবলে ধনসঞ্চয় করিয়া তাঁহাদিগের ভোগ্য ভূসম্পত্তিসকল ক্রয় করিয়াছিলেন।

বাঞ্ছারামের এক পরম বন্ধু ছিলেন, নাম মনোহর দাস। বাঞ্ছারাম মনোহর দাসের সাহায্যেই এই বিভবের অধিপতি হইয়াছিলেন। মনোহর প্রাণপাত করিয়া তাঁহার কার্য করিতেন, নিজে কখনো ধনসঞ্চয় করিতেন না। বাঞ্ছারাম তাঁহার এইসকল গুণে অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন। মনোহরকে সহোদরের ন্যায় ভালোবাসিতেন; এবং মনোহর বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় তাঁহাকে মান্য করিতেন। তাঁহার পিতার সঙ্গে পিতামহের তাদৃশ সম্প্রীতি ছিল না। বোধহয়, উভয়পক্ষেরই কিছু কিছু দোষ ছিল।

একদা রামসদয়ের সঙ্গে মনোহর দাসের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। মনোহর দাস বাঞ্ছারামকে বলিলেন যে, রামসদয় তাঁহাকে কোনো বিষয়ে সহনাতীত অপমান করিয়াছেন। অপমানের কথা বাঞ্ছারামকে বলিয়া, মনোহর তাঁহার কার্য পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে ভবানীনগর হইতে উঠিয়া গেলেন। বাঞ্ছারাম মনোহরকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন; মনোহর কিছুই শুনিলেন না। উঠিয়া কোন্ দেশে গিয়া বাস করিলেন, তাহাও কাহাকে জানাইলেন না।

বাঞ্ছারাম রামসদয়ের প্রতি যত স্নেহ করুন বা না করুন, মনোহরকে ততোধিক স্নেহ করিতেন। সুতরাং রামসদয়ের উপর তাঁহার ক্রোধ অপরিসীম হইল। বাঞ্ছারাম অত্যন্ত কটূক্তি করিয়া গালি দিলেন, রামসদয়ও সকল কথা নিঃশব্দে সহ্য করিলেন না।

পিতা-পুত্রের বিবাদের ফল এই দাঁড়াইল যে, বাঞ্ছারাম পুত্রকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পুত্রও গৃহত্যাগ করিয়া, শপথ করিলেন, আর কখনও পিতৃভবনে

মুখ দেখাইবেন না। বাঞ্ছারাম রাগ করিয়া এক উইল করিলেন। উইলে লিখিত হইল যে, বাঞ্ছারাম মিত্রের সম্পত্তিতে তস্য পুত্র রামসদয় মিত্র কখনো অধিকারী হইবেন না। বাঞ্ছারাম মিত্রের অবর্তমানে মনোহর দাস, মনোহর দাসের অভাবে মনোহরের উত্তরাধিকারিগণ অধিকারী হইবেন; তদভাবে রামসদয়ের পুত্রপৌত্রাদি যথাক্রমে, কিন্তু রামসদয় নহে।

রামসদয় গৃহত্যাগ করিয়া প্রথমা স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। ঐ স্ত্রীর কিছু পিতৃদত্ত অর্থ ছিল। তদবলম্বনে, এবং একজন সজ্জন বণিক সাহেবের আনুকূল্যে তিনি বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলেন; সংসার প্রতিপালনের জন্য তাঁহাকে কোনো কষ্ট পাইতে হইল না।

যদি কষ্ট পাইতে হইত, তাহা হইলে বোধহয়, বাঞ্ছারাম সদয় হইতেন। পুত্রের সুখের অবস্থা শুনিয়া, বৃদ্ধের যে স্নেহাবশেষ ছিল, তাহাও নিবিয়া গেল। পুত্র অভিমানপ্রযুক্ত, পিতা না ডাকিলে আর যাইব না, ইহা স্থির করিয়া, আর পিতার কোনো সম্বাদ লইলেন না। অভক্তি এবং তাচ্ছিল্যবশত পুত্র এরূপ করিতেছে বিবেচনা করিয়া, বাঞ্ছারাম তাঁহাকেও আর ডাকিলেন না।

সুতরাং কাহারও রাগ পড়িল না; উইলও অপরিবর্তিত রহিল। এমত কালে হঠাৎ বাঞ্ছারামের স্বর্গপ্রাপ্তি হইল।

রামসদয় শোকাকুল হইলেন; তাঁহার পিতার মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করিয়া যথাকর্তব্য করেন নাই, এই দুঃখে অনেকদিন ধরিয়া রোদন করিলেন। তিনি আর ভবানীনগর গেলেন না, কলিকাতাতেই পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। কেননা, এক্ষণে ঐ বাটী মনোহর দাসের হইল।

এদিকে মনোহর দাসের কোনো সম্বাদ নাই। পশ্চাৎ জানিতে পারা গেল যে, বাঞ্ছারামের জীবিতাবস্থাতেও মনোহরের কেহ কোনো সম্বাদ পায় নাই। মনোহর দাস ভবানীনগর হইতে-যে গিয়াছিল, সেই গিয়াছিল; কোথায় গেল, বাঞ্ছারাম তাহার অনেক সন্ধান করিলেন; কিছুতেই কোনো সম্বাদ পাইলেন না। তখন তিনি উইলের এক ক্রোড়পত্র সৃজন করিলেন। তাহাতে বিষ্ণুরাম সরকার নামক একজন কলিকাতানিবাসী আত্মীয় কুটুম্বকে উইলের এক্‌জিকিউটর নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে কথা রহিল যে, তিনি সযত্নে মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিবেন। পশ্চাৎ ফলানুসারে সম্পত্তি যাহার প্রাপ্য, তাহাকে দিবেন।

বিষ্ণুরামবাবু অতি বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ, এবং কর্মঠ ব্যক্তি। তিনি বাঞ্ছারামের মৃত্যুর পরেই মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া যাহা বাঞ্ছারাম কর্তৃক অনুসন্ধান হয় নাই, তাহার নিগূঢ় কথা পরিজ্ঞাত হইলেন। স্থূল বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে এই জানা গেল যে, মনোহর ভবানীনগর হইতে পলাইয়া কিছুকাল সপরিবারে ঢাকা অঞ্চলে গিয়া বাস করেন। পরে সেখানে জীবিকানির্বাহের জন্য কিছু কষ্ট হওয়াতে, কলিকাতায় নৌকাযোগে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে বাত্যায় পতিত হইয়া সপরিবারে জলমগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার আর উত্তরাধিকারী ছিল, এমন সন্ধান পাইলেন না।

বিষ্ণুরামবাবু এ-সকল কথার অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রামসদয়কে দেখাইলেন। তখন বাঞ্ছারামের ভূসম্পত্তি শচীন্দ্রদিগের দুই ভ্রাতার হইল; এবং বিষ্ণুরামবাবুও তাহা তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এক্ষণে এই রজনী যদি জীবিত থাকে, তবে যে-সম্পত্তি রামসদয় মিত্র ভোগ করিতেছে, তাহা রজনীর। রজনী হয়তো নিতান্ত দরিদ্রাবস্থাপন্না। সন্ধান করিয়া দেখা যাউক। আমার আর কোনো কাজ নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালায় আসার পর একদা কোনো গ্রাম্য-কুটুম্বের বাড়ি নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে গ্রাম-পর্যটনে গিয়াছিলাম। এক স্থানে অতি মনোহর নিভৃত জঙ্গল ; দয়েল সপ্তস্বর মিলাইয়া আশ্চর্য ঐক্যতানবাদ্য বাজাইতেছে; চারিদিকে বৃক্ষরাজি; ঘনবিন্যস্ত, কোমল শ্যাম পল্লবদলে আচ্ছন্ন; পাতায় পাতায় ঠেসাঠেসি মিশামিশি, শ্যামরূপের রাশি রাশি; কোথাও কলিকা, কোথাও স্ফুটিত পুষ্প, কোথাও অপক্ব, কোথাও সুপক্ব ফল। সেই বনমধ্যে আর্তনাদ শুনিতে পাইলাম। বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একজন বিকটমূর্তি পুরুষ এক যুবতীকে বলপূর্বক আক্রমণ করিতেছে।

দেখিবামাত্র বুঝিলাম, পুরুষ অতি নীচজাতীয় পাষণ্ড—বোধহয় ডোম কি সিউলি—কোমরে দা। গঠন অত্যন্ত বলবানের মতো।

ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাদ্ভাগে গেলাম। গিয়া তাহার কক্কাল হইতে দাখানি টানিয়া লইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিলাম! দুষ্ট তখন যুবতীকে ছাড়িয়া দিল—আমার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। আমাকে গালি দিল। তাহার দৃষ্টি দেখিয়া আমার শঙ্কা হইল।

বুঝিলাম, এ-স্থলে বিলম্ব অকর্তব্য। একেবারে তাহার গলদেশে হস্তার্পণ করিলাম। ছাড়াইয়া সেও আমাকে ধরিল। আমিও তাহাকে পুনর্বার ধরিলাম। তাহার বল অধিক। কিন্তু আমি ভীত হই নাই—বা অস্থির হই নাই। অবকাশ পাইয়া আমি যুবতীকে বলিলাম যে, 'তুমি এই সময় পলাও—আমি ইহার উপযুক্ত দণ্ড দিতেছি।'

যুবতী বলিল, 'কোথায় পালাইব? আমি যে, অন্ধ! এখানকার পথ চিনি না।'

অন্ধ! আমার বল বাড়িল। আমি রজনী নামে একটি অন্ধকন্যাকে খুঁজিতেছিলাম।

দেখিলাম, সেই বলবান পুরুষ আমাকে প্রহার করিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু আমাকে বলপূর্বক টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার অভিপ্রায় বুঝিলাম, যেদিকে আমি দা ফেলিয়া দিয়াছিলাম, সেইদিকে সে আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি তখন দুষ্টকে ছাড়িয়া দিয়া, অগ্রে গিয়া দা কুড়াইয়া লইলাম। সে এক বৃক্ষের ডাল ভাঙিয়া লইয়া, তাহা ফিরাইয়া আমার হস্তে প্রহার করিল, আমার হস্ত হইতে দা পড়িয়া গেল। সে দা তুলিয়া লইয়া, আমাকে তিন-চারি স্থানে আঘাত করিয়া

পলাইয়া গেল।

আমি গুরুতর পীড়াপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বহুকষ্টে আমি কুটুম্বের গৃহাভিমুখে চলিলাম। অন্ধ যুবতী আমার পদশব্দানুসরণ করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া আর আমি চলিতে পারিলাম না। পথিক লোকে আমাকে ধরিয়া আমার কুটুম্বের বাড়িতে রাখিয়া আসিল।

সেই স্থানে আমি কিছুকাল শয্যাগত রহিলাম—অন্য আশ্রয়াভাবেও বটে, এবং আমার দশা কী হয়, তাহা না-জানিয়া কোথায় যাইতে পারে না, সেজন্যও বটে, অন্ধ যুবতীও সেইখানে রহিল।

বহু দিনে, বহু কষ্টে, আমি আরোগ্যলাভ করিলাম।

মেয়েটি অন্ধ দেখিয়া অবধিই আমার সন্দেহ হইয়াছিল। যেদিন প্রথম আমার বাক্‌শক্তি হইল, সে আমার রুগ্‌ণশয্যাপার্শ্বে আসিল, সেইদিনই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার নাম কী গা?'

'রজনী।'

আমি চমকিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি রাজচন্দ্র দাসের কন্যা?'

রজনীও বিস্মিতা হইল। বলিল, 'আপনি বাবাকে কি চেনেন?'

আমি স্পষ্টত কোনো উত্তর দিলাম না।

আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে, রজনীকে কলিকাতায় লইয়া গেলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় গমনকালে আমি একা রজনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলাম না। কুটুম্বগৃহ হইতে তিনকড়ি নামে একজন প্রাচীনা পরিচারিকা সমভিব্যাহারে লইয়া গেলাম। এ সতর্কতা রজনীর মন প্রসন্ন করিবার জন্য। গমনকালে রজনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রজনী—তোমাদের বাড়ি কলিকাতায়—কিন্তু তুমি এখানে আসিলে কী প্রকারে?'

রজনী বলিল, 'আমাকে কি সকল কথা বলিতে হইবে?'

আমি বলিলাম, 'তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, তবে বলিও না।'

বস্তুত এই অন্ধ স্ত্রীলোকের বুদ্ধি, বিবেচনা এবং সরলতায় আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছিলাম। তাহাকে কোনোপ্রকার ক্লেশ দিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। রজনী বলিল, 'যদি অনুমতি করিলেন, তবে কতক কথা গোপন রাখিব। গোপালবাবু বলিয়া আমার একজন প্রতিবাসী আছেন। তাঁহার স্ত্রী চাঁপা। চাঁপার সঙ্গে আমার হঠাৎ পরিচয় হইয়াছিল। তাহার বাপের বাড়ি হুগলি। সে আমাকে বলিল, 'আমার বাপের বাড়ি যাইবে?' আমি রাজি হইলাম। সে আমাকে একদিন সঙ্গে করিয়া গোপালবাবুর বাড়িতে লইয়া আসিল। কিন্তু তাহার বাপের বাড়ি আমাকে পাঠাইবার সময় আপনি আমার সঙ্গে আসিল না। তাহার ভাই হীরালালকে আমার সঙ্গে দিল। হীরালালও নৌকা করিয়া আমায় হুগলি লইয়া চলিল।'

আমি এইখানে বুঝিতে পারিলাম যে, রজনী হীরালাল সম্বন্ধে কথা গোপন করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি তাহার সঙ্গে গেলে?'

রজনী বলিল, 'ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যাইতে হইল। কেন যাইতে হইল, তাহা বলিতে পারিব না। পথিমধ্যে হীরালাল আমার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। আমি তাহার বাধ্য নহি দেখিয়া, সে আমাকে বিনাশ করিবার জন্য, গঙ্গার এক চরে নামাইয়া দিয়া নৌকা লইয়া চলিয়া গেল।'

রজনী চুপ করিল—আমি হীরালালকে ছদ্মবেশী রাক্ষস মনে করিয়া, মনে মনে তাহার রূপ ধ্যান করিতে লাগিলাম—তারপর রজনী বলিতে লাগিল, 'সে চলিয়া গেলে আমি ডুবিয়া মরিব বলিয়া জলে ডুবিলাম।'

আমি বলিলাম, 'কেন? তুমি কি হীরালালকে এত ভালোবাসিতে?'

রজনী ভ্রূকুটি করিল। বলিল, 'তিলার্ধ না। আমি পৃথিবীতে কাহারও উপর এত বিরক্ত নহি।'

'তবে ডুবিয়া মরিতে গেলে কেন?'

'আমার যে-দুঃখ, তাহা আপনাকে বলিতে পারি না।'

'আচ্ছা। বলিয়া যাও।'

'আমি জলে ডুবিয়া ভাসিয়া উঠিলাম। একখানা গহনার নৌকা যাইতেছিল। সেই নৌকার লোক আমাকে ভাসিতে দেখিয়া উঠাইল। যে গ্রামে আপনার সহিত সাক্ষাৎ, সেইখানে একজন আরোহী নামিল। সে নামিবার সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কোথায় নামিবে?' আমি বলিলাম, 'আমাকে যেখানে নামাইয়া দিবে, আমি সেইখানে নামিব।' তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার বাড়ি কোথায়?' আমি বলিলাম, 'কলিকাতায়।' সে বলিল, 'আমি কালি আবার কলিকাতায় যাইব। তুমি আজ আমার সঙ্গে আইস। আজি আমার বাড়ি থাকিবে। কালি তোমাকে কলিকাতায় রাখিয়া আসিব।' আমি আনন্দিত হইয়া তাহার সঙ্গে উঠিলাম। সে আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। তার পর আপনি সব জানেন।'

আমি বলিলাম, 'আমি যাহার হাত হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়াছিলাম, সে কি সেই?'

'সে সেই।'

আমি রজনীকে কলিকাতায় আনিয়া, তাহার কথিত স্থানে অন্বেষণ করিয়া, রাজচন্দ্র দাসের বাড়ি পাইলাম। সেইখানে রজনীকে লইয়া গেলাম।

রাজচন্দ্র কন্যা পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহার স্ত্রী অনেক রোদন করিল। উহারা আমার কাছে রজনীর বৃত্তান্ত সবিশেষ শুনিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

পরে রাজচন্দ্রকে আমি নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার কন্যা গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল কেন জানো?'

রাজচন্দ্র বলিল, 'না। আমি তাহা সর্বদাই ভাবি, কিন্তু কিছুই ঠিকানা করিতে পারি নাই।'

আমি বলিলাম, 'রজনী জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল কী দুঃখে জানো?'

রাজচন্দ্র বিস্মিত হইল। বলিল, 'রজনীর এমন কী দুঃখ, কিছুই তো ভাবিয়া পাই না। সে অন্ধ, এটি বড় দুঃখ বটে, কিন্তু তার জন্য এতদিনের পর ডুবিয়া মরিতে যাইবে

কেন? তবে, এতবড় মেয়ে, আজিও তাহার বিবাহ হয় নাই। কিন্তু তাহার জন্যও নয়। তাহার তো সম্বন্ধ করিয়া বিবাহ দিতেছিলাম। বিবাহের আগের রাত্রেই পলাইয়াছিল।'

আমি নূতন কথা পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সে পলাইয়াছিল?'

রাজ। হাঁ।

আমি। তোমাদিগকে না বলিয়া?

রাজ। কাহাকেও না বলিয়া।

আমি। কাহার সহিত সম্বন্ধ করিয়াছিলে?

রাজ। গোপালবাবুর সঙ্গে।

আমি। কে গোপাল বাবু? চাঁপার স্বামী?

রাজ। আপনি সবই তো জানেন। সেই বটে।

আমি একটু আলো দেখিলাম। তবে চাঁপা সপত্নীযন্ত্রণাভয়ে রজনীকে প্রবঞ্চনা করিয়া ভ্রাতৃসঙ্গে হুগলি পাঠাইয়াছিল। বোধহয়, তাহারই পরামর্শে হীরালাল উহার বিনাশে উদ্যোগ পাইয়াছিল।

সে-কথা কিছু না বলিয়া রাজচন্দ্রকে বলিলাম, 'আমি সবই জানি। আমি আরও যাহা জানি, তোমায় বলিতেছি। তুমি কিছু লুকাইও না।'

রাজ। কী—আজ্ঞা করুন।

আমি। রজনী তোমার কন্যা নহে।

রাজচন্দ্র বিস্মিত হইল। বলিল, 'সে কী! আমার মেয়ে নয় তো কাহার?'

'হরেকৃষ্ণ দাসের।'

রাজচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। শেষে বলিল, 'আপনি কে, তাহা জানি না। কিন্তু আপনার পায়ে পড়ি, এ-কথা রজনীকে বলিবেন না।'

আমি। এখন বলিব না। কিন্তু বলিতে হইবে। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার সত্য উত্তর দাও। যখন হরেকৃষ্ণ মরিয়া যায়, তখন রজনীর কিছু অলঙ্কার ছিল?

রাজচন্দ্র ভীত হইল। বলিল, 'আমি তো তাহার অলঙ্কারের কথা কিছু জানি না। অলঙ্কার কিছুই পাই নাই।'

আমি। হরেকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তুমি তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির সন্ধানে সে-দেশে আর গিয়াছিলে?

রাজ। হাঁ, গিয়াছিলাম। গিয়া শুনিলাম, হরেকৃষ্ণের যাহা কিছু ছিল তাহা পুলিশে লইয়া গিয়াছে।

আমি। তাহাতে তুমি কী করিলে?

রাজ। আমি আর কী করিব? আমি পুলিশকে বড় ভয় করি, রজনীর বালাচুরি মোকদ্দমায় বড় ভুগিয়াছিলাম। আমি পুলিশের নাম শুনিয়া আর কিছু বলিলাম না।

আমি। রজনীর বালাচুরি মোকদ্দমা কিরূপ?

রাজ। রজনীর অন্নপ্রাশনের সময় তাহার বালা চুরি গিয়াছিল। চোর ধরা পড়িয়াছিল। বর্ধমানে তাহার মোকদ্দমা হইয়াছিল। এই কলিকাতা হইতে বর্ধমানে আমাকে সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইয়াছিল। বড় ভুগিয়াছিলাম।

আমি পথ দেখিতে পাইলাম।

তৃতীয় খণ্ড

শচীন্দ্র বক্তা

প্রথম পরিচ্ছেদ

এ ভার আমার প্রতি হইয়াছে—রজনীর জীবনচরিত্রের এ অংশ আমাকে লিখিতে হইবে। লিখিব।

আমি রজনীর বিবাহের সকল উদ্যোগ করিয়াছিলাম—বিবাহের দিন প্রাতে শুনিলাম যে, রজনী পলাইয়াছে, তাহাকে আর পাওয়া যায় না। তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম না। কেহ বলিল, সে ভ্রষ্টা। আমি বিশ্বাস করিলাম না। আমি তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছিলাম—শপথ করিতে পারি, সে কখনো ভ্রষ্টা হইতে পারে না। তবে ইহা হইতে পারে যে, সে কুমারী, কৌমার্যাবস্থাতেই কাহারও প্রণয়াসক্ত হইয়া বিবাহাশঙ্কায় গৃহত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও দুইটি আপত্তি; প্রথম, সে অন্ধ, সে কী প্রকারে সাহস করিয়া আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইবে? দ্বিতীয়ত, যে অন্ধ, সে কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে? মনে করিলাম, কদাচ না। কেহ হাসিও না, আমার মতো গণ্ডমূর্খ অনেক আছে। আমরা খানদুই-তিন বহি পড়িয়া, মনে করি, জগতের চেতনাচেতনের গূঢ়াদপি গূঢ় তত্ত্ব সকলই নখদর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি, যাহা আমাদের বুদ্ধিতে ধরে না, তাহা বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর মানি না, কেননা আমাদের ক্ষুদ্র বিচারশক্তিতে যে বৃহত্তত্ত্বের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি না, অন্ধের রূপোন্মাদ কী প্রকারে বুঝিব?

সন্ধান করিতে করিতে জানিলাম যে, যে-রাত্রি হইতে রজনী অদৃশ্য হইয়াছে, সেই রাত্রি হইতে হীরালালও অদৃশ্য হইয়াছে। সকলে বলিতে লাগিল, হীরালালের সঙ্গে সে কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। অগত্যা আমি এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, হীরালাল রজনীকে ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়াছে। রজনী পরমা সুন্দরী; কানা হউক, এমন লোক নাই, যে তাহার রূপে মুগ্ধ হইবে না। হীরালাল তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে বঞ্চনা করিয়া লইয়া গিয়াছে। অন্ধকে বঞ্চনা করা বড় সুসাধ্য।

কিছুদিন পরে হীরালাল দেখা দিল। আমি তাহাকে বলিলাম, 'তুমি রজনীর সম্বাদ জানো?'—সে বলিল, 'না।'

কী করিব। নালিশ, ফরিয়াদ হইতে পারে না। আমার জ্যেষ্ঠকে বলিলাম। জ্যেষ্ঠ বলিলেন, 'রাস্কালকে মারো।' কিন্তু মারিয়া কী হইবে? আমি সম্বাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিলাম। যে রজনীর সন্ধান দিবে, তাহাকে অর্থ পুরস্কার দিব, ঘোষণা করিলাম। কিছু ফল ফলিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রজনী জন্মান্ধ, কিন্তু তাহার চক্ষু দেখিলে অন্ধ বলিয়া বোধ হয় না। চক্ষে দেখিতে কোনো দোষ নাই। চক্ষু বৃহৎ, সুনীল, ভ্রমরকৃষ্ণতারাবিশিষ্ট। অতি সুন্দর চক্ষু—কিন্তু কটাক্ষ নাই। চাক্ষুষ স্নায়ুর দোষে অন্ধ। স্নায়ুর নিশ্চেষ্টতাবশত রেটিনাস্থিত প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে গৃহীত হয় না। রজনী সর্বাঙ্গসুন্দরী; বর্ণ উদ্ভেদ-প্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলীপত্রের ন্যায় গৌর, গঠন বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিণীর ন্যায় সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত; মুখকান্তি গম্ভীর; গতি, অঙ্গভঙ্গি সকল মৃদু, স্থির এবং অন্ধতাবশত সর্বদা সঙ্কোচজ্ঞাপক; হাস্য দুঃখময়। সচরাচর এই স্থিরপ্রকৃতি সুন্দর শরীরে সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া কোনো ভাস্কর্যপটু শিল্পকরের যত্ননির্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্তি বলিয়া বোধ হইত।

রজনীকে প্রথম দেখিয়াই আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এই সৌন্দর্য অনিন্দনীয় হইলেও মুগ্ধকর নহে। রজনী রূপবতী, কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া কেহ কখনো পাগল হইবে না। তাহার চক্ষের সে মোহিনী গতি নাই। সৌন্দর্য দেখিয়া লোকে প্রশংসা করিবে; বোধহয় সে-মূর্তি সহজে ভুলিবেও না; কেননা সে স্থির, গম্ভীর কান্তির একটু অদ্ভুত আকর্ষণীশক্তি আছে। কিন্তু সেই আকর্ষণ অন্যবিধ; ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই। যাহাকে 'পঞ্চবাণ' বলে, রজনীর রূপের সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই। নাই কি?

সে যাহাই হউক—আমি মধ্যে মধ্যে চিন্তা করিতাম—রজনীর দশা কী হইবে? সে ইতর-লোকের কন্যা, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই বোধহয় যে, সে ইতর প্রকৃতিবিশিষ্ট নহে। ইতর লোক ভিন্ন, তাহার অন্যত্র বিবাহের সম্ভাবনা নাই। ইতর লোকের সঙ্গেও এতকালে বিবাহ ঘটে নাই। দরিদ্রের ভার্যা গৃহকর্মের জন্য, যে ভার্যার অন্ধতানিবন্ধন গৃহকর্মের সাহায্য হইবে না—তাহাকে কোন্ দরিদ্র বিবাহ করিবে? কিন্তু ইতর-লোক ভিন্ন এই ইতরবৃত্তিপরায়ণ কায়স্থের কন্যা কে বিবাহ করিবে? তাহাতে আবার এ অন্ধ। এরূপ স্বামীর সহবাসে রজনীর দুঃখ ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই। দুশ্ছেদ্য কণ্টক-কানন মধ্যে যত্নপালনীয় উদ্যানপুষ্পের জন্মের ন্যায়, এই রজনীর পুষ্পবিক্রেতার গৃহে জন্ম ঘটিয়াছে। কণ্টকাবৃত হইয়াই ইহাকে মরিতে হইবে। তবে আমি গোপালের সঙ্গে ইহার বিবাহ দিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? ঠিক জানি না। তবে ছোটমার দৌরাত্ম্য বড়; তাঁহারই উত্তেজনাতে ইহার বিবাহ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আর বলিতে কী, যাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে না পারি, তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে।

এ-কথা শুনিয়া অনেক সুন্দরী মধুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তোমার মনে মনে রজনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে কি? না, সে ইচ্ছা নাই। রজনী সুন্দরী হইলেও অন্ধ; রজনী পুষ্পবিক্রেতার কন্যা এবং রজনী অশিক্ষিতা। রজনীকে আমি বিবাহ করিতে পারি না; ইচ্ছাও নাই। আমার বিবাহে অনিচ্ছাও নাই। তবে মনোমতো কন্যা পাই না। আমি যাহাকে বিবাহ করিব, সে রজনীর মতো সুন্দরী হইবে, অথচ বিদ্যুৎকটাক্ষবর্ষিণী হইবে; বংশমর্যাদায় শাহ আলমের বা মহুররাও হুল্কারের প্রপরাপসং-পৌত্রী হইবে, বিদ্যায় লীলাবতী বা শাপভ্রষ্টা সরস্বতী হইবে; এবং পতিভক্তিতে সাবিত্রী হইবে; চরিত্রে লক্ষ্মী, রন্ধনে দ্রৌপদী, আদরে সত্যভামা এবং গৃহকর্মে গদার মা। আমি পান খাইবার সময়ে পানের লবঙ্গ খুলিয়া দিবে, তামাকু খাইবার সময়ে হুঁকায় কলিকা আছে কি না, বলিয়া দিবে, আহারের সময়ে মাছের কাঁটা বাছিয়া দিবে, এবং স্নানের পর গা মুছিয়াছি কি না, তদারক করিবে। আমি চা খাইবার সময়ে, দোয়াতের ভিতরে চামচে পুরিয়া চার অনুসন্ধান না করি, এবং কালির অনুসন্ধানে চার পাত্রমধ্যে কলম না দিই, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবে; পিক্‌দানিতে টাকা রাখিয়া বাক্সের ভিতর ছেপ না ফেলি, তাহার খবরদারি করিবে। বন্ধুকে পত্র লিখিয়া আপনার নামে শিরোনামা দিলে, সংশোধন করাইয়া লইবে, পয়সা দিতে টাকা দিতেছি কি না, খবর লইবে; নোটের পিঠে দোকানের চিঠি কাটিতেছি কি না দেখিবে; এবং তামাশা করিবার সময়ে বিয়ানের নামের পরিবর্তে ভক্তিমতী প্রতিবাসিনীর নাম করিলে, ভুল সংশোধন করিয়া লইবে। ঔষধ খাইতে ফুলেল তৈল না খাই; চাকরানীর নাম করিয়া ডাকিতে, হৌসের সাহেবের মেমের নাম না ধরি এ-সকল বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকিবে। এমত কন্যা পাই, তবে বিবাহ করি। আপনারা—যে ইনি ওঁকে টিপিয়া হাসিতেছেন, আপনাদের মধ্যে যদি কেহ অবিবাহিতা এবং এইসকল গুণে গুণবতী থাকেন, তবে বলুন, আমি পুরোহিত ডাকি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শেষে রাজচন্দ্র দাসের কাছে শুনিতে পাইলাম যে, রজনীকে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজচন্দ্র দাস এ-বিষয়ে আমাদিগের সঙ্গে বড় চমৎকার ব্যবহার করিতে লাগিল। রজনীকে কোথায় পাওয়া গেল, কী প্রকারে পাওয়া গেল, তাহা কিছুই বলিল না। আমরা অনেক জিজ্ঞাসা করিলাম, কিছুতেই কোনো কথা বাহির করিতে পারিলাম না। সে কেনই বা গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহাও জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম, তাহাও বলিল না। তাহার স্ত্রীও ঐরূপ—ছোটমা, সূচীর ন্যায় লোকের মনের ভিতর প্রবেশ করেন, কিন্তু তাহার কাছ হইতে কোনো কথাই বাহির করিতে পারিলেন না। রজনী স্বয়ং আর আমাদের বাড়িতে আসিত না। কেন আসিত না, তাহাও কিছু জানিতে পারিলাম না। শেষে রাজচন্দ্র ও তাহার স্ত্রীও আমাদিগের বাড়ি আসা পরিত্যাগ করিল। ছোটমা কিছু দুঃখিত হইয়া তাহাদিগের অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন।

লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, উহারা সপরিবারে অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছে, সাবেক বাড়িতে আর নাই। কোথায় গিয়াছে, তাহার কোনো ঠিকানা করিতে পারিলাম না।

ইহার এক মাস পরে, একজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি আসিয়াই, আপনি আত্মপরিচয় দিলেন। 'আমার নিবাস কলিকাতায় নহে। আমার নাম অমরনাথ ঘোষ, আমার নিবাস শান্তিপুর।'

তখন আমি তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে নিযুক্ত হইলাম। কীজন্য তিনি আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। তিনিও প্রথমে কিছু বলিলেন না। সুতরাং সামাজিক ও রাজকীয় বিষয়ঘটিত নানা কথাবার্তা হইতে লাগিল। দেখিলাম, তিনি কথাবার্তায় অত্যন্ত বিচক্ষণ। তাঁহার বুদ্ধি মার্জিত, শিক্ষা সম্পূর্ণ, এবং চিন্তা বহুদূরগামিনী। কথাবার্তায় একটু অবসর পাইয়া, তিনি আমার টেবিলের উপর স্থিত 'শেক্সপিয়র গেলেরি'র পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। ততক্ষণ আমি অমরনাথকে দেখিয়া লইতে লাগিলাম। অমরনাথ দেখিতে সুপুরুষ; গৌরবর্ণ, কিঞ্চিৎ খর্ব, স্থূলও নহে, শীর্ণও নহে; বড় বড় চক্ষু, কেশগুলি সূক্ষ্ম, কুঞ্চিত, যত্নরঞ্জিত। বেশভূষার পারিপাট্যের বাড়াবাড়ি নাই, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বটে। তাঁহার কথা কহিবার ভঙ্গি অতি মনোহর; কণ্ঠ অতি সুমধুর। দেখিয়া বুঝিলাম, লোক অতি সুচতুর।

শেক্সপিয়র গেলেরির পাতা উল্টানো শেষ হইলে অমরনাথ নিজ প্রয়োজনের কথা কিছু না বলিয়া, ঐ পুস্তকস্থিত চিত্রসকলের সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যাহা বাক্য এবং কার্যদ্বারা চিত্রিত হইয়াছে, তাহা চিত্রফলকে চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাওয়া ধৃষ্টতার কাজ। সে চিত্র কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না; এবং এ-সকল চিত্রও সম্পূর্ণ নহে। ডেস্‌ডিমনার চিত্র দেখাইয়া কহিলেন, আপনি এই চিত্রে ধৈর্য, মাধুর্য, নম্রতা পাইতেছেন, কিন্তু ধৈর্যের সহিত সে সাহস কই? নম্রতার সঙ্গে সে সতীত্বের অহঙ্কার কই? জুলিয়েটের মূর্তি দেখাইয়া কহিলেন, এ নবযুবতীর মূর্তি বটে, কিন্তু ইহাতে জুলিয়েটের নবযৌবনের অদমনীয় চাঞ্চল্য কই?

অমরনাথ এইরূপ কত বলিতে লাগিলেন। শেক্সপিয়রের নায়িকাগণ হইতে শকুন্তলা, সীতা, কাদম্বরী, বাসবদত্তা, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি আসিয়া পড়িল। অমরনাথ একে একে তাঁহাদিগের চরিত্রের বিশ্লেষণ করিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের কথায় ক্রমে প্রাচীন ইতিহাসের কথা আসিয়া পড়িল, তৎপ্রসঙ্গে তাসিতস, প্লুটার্ক, থুকিদিদিস প্রভৃতির অপূর্ব সমালোচনার অবতারণা হইল। প্রাচীন ইতিবৃত্ত-লেখকদিগের মত লইয়া অমরনাথ কোম্‌তের ত্রৈকালিক উন্নতিসম্বন্ধীয় মতের সমর্থন করিলেন। কোম্‌ৎ হইতে তাঁহার সমালোচক মিল ও হক্‌স্‌লির কথা আসিল। হক্‌স্‌লি হইতে ওয়েন ও ডারুইন, ডারুইন হইতে বুকনেয়র সোপেনহয়র প্রভৃতির সমালোচনা আসিল। অমরনাথ অপূর্ব পাণ্ডিত্যস্রোত আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। আমি মুগ্ধ হইয়া আসল কথা ভুলিয়া গেলাম।

বেলা গেল দেখিয়া, অমরনাথ বলিলেন, 'মহাশয়কে আর বিরক্ত করিব না। যে জন্য আসিয়াছিলাম, তাহা এখনও বলা হয় নাই। রাজচন্দ্র দাস যে আপনাদিগকে ফুল বেচিত, তাহার একটি কন্যা আছে?'

আমি বলিলাম, 'আছে বোধহয়।'

অমরনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'বোধহয় নয়, সে আছে। আমি তাহাকে বিবাহ করিব স্থির করিয়াছি।'

আমি অবাক হইলাম। অমরনাথ বলিতে লাগিলেন, 'আমি রাজচন্দ্রের নিকটে এই কথা বলিতেই গিয়াছিলাম। তাহাকে বলা হইয়াছে। এক্ষণে আপনাদিগের সঙ্গে একটা কথা আছে। যে-কথা বলিব, তাহা মহাশয়ের পিতার কাছে বলাই আমার উচিত; কেননা, তিনি কর্তা। কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহাতে আপনাদিগের রাগ করিবার কথা। আপনি সর্বাপেক্ষা স্থিরস্বভাব এবং ধর্মজ্ঞ, এজন্য আপনাকেই বলিতেছি।'

আমি বলিলাম, 'কী কথা মহাশয়?'

অমর। রজনীর কিছু বিষয় আছে।

আমি। সে কী! সে যে রাজচন্দ্রের কন্যা।

অমর। রাজচন্দ্রের পালিত কন্যা মাত্র।

আমি। তবে সে কাহার কন্যা? কোথায় বিষয় পাইল? এ-কথা আমরা এতদিন শুনিলাম না কেন?

অমর। আপনারা যে-সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, ইহাই রজনীর। রজনী মনোহর দাসের ভ্রাতুষ্কন্যা।

একবার, প্রথমে চমকিয়া উঠিলাম। তারপর বুঝিলাম যে, কোনো জালসাজ জুয়াচোরের হাতে পড়িয়াছি। প্রকাশ্যে উচ্চৈঃহাস্য করিয়া বলিলাম, 'মহাশয়কে নিষ্কর্মা লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার অনেক কর্ম আছে। এক্ষণে আপনার সঙ্গে রহস্যের আমার অবসর নাই। আপনি গৃহে গমন করুন।'

অমরনাথ বলিল, 'তবে উকিলের মুখে সম্বাদ শুনিবেন।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এদিকে বিষ্ণুরামবাবু সম্বাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, মনোহর দাসের উত্তরাধিকারী উপস্থিত হইয়াছে—বিষয় ছাড়িয়া দিতে হইবে। অমরনাথ তবে জুয়াচোর জালসাজ নহে!

কে উত্তরাধিকারী, তাহা বিষ্ণুরামবাবু প্রথমে কিছু বলেন নাই। কিন্তু অমরনাথের কথা স্মরণ হইল। বুঝি রজনীই উত্তরাধিকারিণী। যে-ব্যক্তি দাবিদার, সে-যে মনোহর দাসের যথার্থ উত্তরাধিকারী, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা আছে কি না, ইহা জানিবার জন্য বিষ্ণুরামবাবুর কাছে গেলাম। আমি বলিলাম, 'মহাশয়, পূর্বে বলিয়াছিলেন যে, মনোহর দাস সপরিবারে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তাহার প্রমাণও আছে। তবে তাহার আবার ওয়ারিশ আসিল কোথা হইতে?'

বিষ্ণুরাম-বাবু বলিলেন, 'হরেকৃষ্ণ দাস নামে তাহার এক ভাই ছিল, জানেন বোধহয়।'

আমি। তা তো জানি। কিন্তু সেও তো মরিয়াছে।

বিষ্ণু। বটে, কিন্তু মনোহরের পর মরিয়াছে। সুতরাং সে বিষয়ের অধিকারী হইয়া মরিয়াছে।

আমি। তা হৌক, কিন্তু হরেকৃষ্ণেরও তো এক্ষণে কেহ নাই?

বিষ্ণু। পূর্বে তাহাই মনে করিয়া আপনাদিগকে বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে জানিতেছি যে, তাহার এক কন্যা আছে।

আমি। তবে এতদিন সে-কন্যার কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই কেন?

বিষ্ণু। হরেকৃষ্ণের স্ত্রী তাহার পূর্বে মরে; স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শিশুকন্যাকে পালন করিতে অক্ষম হইয়া হরেকৃষ্ণ কন্যাটিকে তাহার শ্যালীকে দান করে। তাহার শ্যালী ঐ কন্যাটিকে আত্মকন্যাবৎ প্রতিপালন করে, এবং আপনার বলিয়া পরিচয় দেয়। হরেকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি লাওয়ারেশ বলিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকর্তৃক গৃহীত হওয়ার প্রমাণ পাইয়া, আমি হরেকৃষ্ণকে লাওয়ারেশ মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে হরেকৃষ্ণের একজন প্রতিবাসী আমার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার কন্যার কথা প্রকাশ করিয়াছে। আমি তাহার প্রদত্ত সন্ধানের অনুসরণ করিয়া জানিয়াছি যে, তাহার কন্যা আছে বটে।

আমি বলিলাম, 'যে হয় একটা মেয়ে ধরিয়া হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা বলিয়া ধূর্ত লোক উপস্থিত করিতে পারে। কিন্তু সে-যে যথার্থ হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা, তাহার কিছু প্রমাণ আছে কি?'

'আছে।' বলিয়া বিষ্ণুরামবাবু আমাকে একটা কাগজ দেখিতে দিলেন, বলিলেন, 'এ বিষয়ে যে-যে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা উহাতে ইয়াদ দাস্ত করিয়া রাখিয়াছি।'

আমি ঐ কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলাম। তাহাতে পাইলাম যে, হরেকৃষ্ণ দাসের শ্যালীপতি রাজচন্দ্র দাস এবং হরেকৃষ্ণের কন্যার নাম রজনী।

প্রমাণ যাহা দেখিলাম, তাহা ভয়ানক বটে। আমরা এতদিন অন্ধ রজনীর ধনে ধনী হইয়া তাহাকে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছিলাম।

বিষ্ণুরাম একটি জোবানবন্দির জাবেতা নকল আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'এক্ষণে দেখুন, এই জোবানবন্দি কাহার?'

আমি পড়িয়া দেখিলাম যে, জোবানবন্দির বক্তা হরেকৃষ্ণ দাস। ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে তিনি এক বালাচুরির মোকদ্দমায় এই জোবানবন্দি দিতেছেন। জোবানবন্দিতে পিতার নাম ও বাসস্থান লেখা থাকে; তাহাও পড়িয়া দেখিলাম। তাহা মনোহর দাসের পিতার নাম ও বাসস্থানের সঙ্গে মিলিল। বিষ্ণুরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মনোহর দাসের ভাই হরেকৃষ্ণের এই জোবানবন্দি বলিয়া আপনার বোধ হইতেছে কি না?'

আমি। বোধ হইতেছে।

বিষ্ণু। যদি সংশয় থাকে, তবে এখনই তাহা ভঞ্জন হইবে। পড়িয়া যাউন।

পড়িতে লাগিলাম যে, সে বলিতেছে, 'আমার ছয়মাসের একটি কন্যা আছে। এক সপ্তাহ হইল, তাহার অন্নপ্রাশন দিয়াছি। অন্নপ্রাশনের দিন বৈকালে তাহার বালা চুরি গিয়াছে।'

এই পর্যন্ত পড়িয়া দেখিলে, বিষ্ণুরাম বলিলেন, 'দেখুন কত দিনের জোবানবন্দি?'

জোবানবন্দির তারিখ দেখিলাম, জোবানবন্দি উনিশ বৎসরের।

বিষ্ণুরাম বলিলেন, 'ঐ কন্যার বয়স এক্ষণে হিসাব কত হয়?'

আমি। উনিশ বৎসর কয় মাস—প্রায় কুড়ি।

বিষ্ণু। রজনীর বয়স কত অনুমান করেন?

আমি। প্রায় কুড়ি।

বিষ্ণু। পড়িয়া যাউন; হরেকৃষ্ণ কিছু পরে বালিকার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

আমি পড়িতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, এক স্থানে হরেকৃষ্ণ পুনঃপ্রাপ্ত বালা দেখিয়া বলিতেছেন, 'এই বালা আমার কন্যা রজনীর বালা বটে।'

আর বড় সংশয়ের কথা রহিল না—তথাপি পড়িতে লাগিলাম—প্রতিবাদীর মোক্তার হরেকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'তুমি দরিদ্র লোক। তোমার কন্যাকে সোনার বালা দিলে কী প্রকারে?' হরেকৃষ্ণ উত্তর দিতেছে, 'আমি গরিব, কিন্তু আমার ভাই, মনোহর দাস দশটাকা উপার্জন করেন। তিনি আমার মেয়েকে সোনার গহনাগুলি দিয়াছেন।'

তবে-যে এই হরেকৃষ্ণ দাস আমাদিগের মনোহর দাসের ভাই, তদ্বিষয়ে আর সংশয়ের স্থান রহিল না।

পরে মোক্তার আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'তোমার ভাই তোমার পরিবার বা তোমার আর কাহাকে কখনো অলঙ্কার দিয়াছে?'

উত্তর। না।

পুনশ্চ প্রশ্ন। সংসার খরচ দেয়?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তবে তোমার কন্যাকে অন্নপ্রাশনে সোনার গহনা দিবার কারণ কী?

উত্তর। আমার এই মেয়েটি জন্মান্ধ। সেজন্য আমার স্ত্রী সর্বদা কাঁদিয়া থাকে। আমার ভাই ও ভাইজ তাহাতে দুঃখিত হইয়া, আমাদিগের মনোদুঃখ যদি কিছু নিবারণ হয়, এই ভাবিয়া অন্নপ্রাশনের সময় মেয়েটিকে এই গহনাগুলি দিয়াছিলেন।

জন্মান্ধ! তবে-যে সে এই রজনী, তদ্বিষয়ে আর সংশয় কী!

আমি হতাশ হইয়া জোবানবন্দি রাখিয়া দিলাম। বলিলাম, 'আমার আর বড় সন্দেহ নাই।'

বিষ্ণুরাম বলিলেন, 'অত অল্প প্রমাণে আপনাকে সন্তুষ্ট হইতে বলি না। আর একটা জোবানবন্দির নকল দেখুন।'

দ্বিতীয় জোবানবন্দিও দেখিলাম যে, উহাও ঐ কথিত বালাচুরির মোকদ্দমায় গৃহীত হইয়াছিল। এই জোবানবন্দিতে বক্তা রাজচন্দ্র দাস। তিনি একমাত্র কুটম্ব বলিয়া ঐ অন্নপ্রাশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হরেকৃষ্ণের শ্যালীপতি বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন এবং চুরির বিষয় সকল সপ্রমাণ করিতেছেন।

বিষ্ণুরাম বলিলেন, 'উপস্থিত রাজচন্দ্র দাস সেই রাজচন্দ্র দাস। সংশয় থাকে, ডাকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন।'

আমি বলিলাম, 'নিষ্প্রয়োজন।'

বিষ্ণুরাম আরও কতকগুলি দলিল দেখাইলেন, সে-সকলের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিতে গেলে, সকলের ভালো লাগিবে না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই রজনী দাসী যে হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা, তদ্বিষয়ে আমার সংশয় রহিল না। তখন দেখিলাম, বৃদ্ধ পিতামাতা লইয়া অন্নের জন্য কাতর হইয়া বেড়াইব!

বিষ্ণুরামকে বলিলাম, 'মোকদ্দমা করা বৃথা। বিষয় রজনী দাসীর, তাঁহার বিষয় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব। তবে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে তুল্যাধিকারী। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা রহিল মাত্র।'

আমি একবার আদালতে গিয়া, আসল জোবানবন্দি দেখিয়া আসিলাম। এখন পুরাণ নথি ছিঁড়িয়া ফেলে, তখন রাখিত। আসল দেখিয়া জানিলাম যে, নকলে কোনো কৃত্রিমতা নাই।

বিষয় রজনীকে ছাড়িয়া দিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রজনীকে বিষয় ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু কেহ তো সে-বিষয় দখল করিল না।

রাজচন্দ্র দাস একদিন দেখা করিতে আসিল। তাহার মুখে শুনিলাম, সে শিমলায় একটি বাড়ি কিনিয়া সেইখানে রজনীকে লইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, টাকা কোথায় পাইলে? রাজচন্দ্র বলিল, অমরনাথ কর্জ দিয়াছেন, পশ্চাৎ বিষয় হইতে শোধ হইবে। জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তবে তোমরা বিষয় দখল লইতেছ না কেন? তাহাতে সে বলিল, সে-সকল কথা অমরনাথবাবু জানেন। অমরনাথবাবু কি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন? তাহাতে রাজচন্দ্র বলিল, না। পরে রাজচন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথন করিতে করিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রাজচন্দ্র, তোমায় এতদিন দেখি নাই কেন?'

রাজচন্দ্র বলিল, 'একটু গা ঢাকা হইয়াছিলাম।'

আমি। কার কী চুরি করিয়াছ যে, গা ঢাকা হইয়াছিলে?

রাজ। চুরি করিব কার? তবে অমরনাথবাবু বলিয়াছিলেন যে, এখন বিষয় লইয়া গোলযোগ হইতেছে, এখন একটু আড়াল হওয়াই ভালো। মানুষের চক্ষুলজ্জা আছে তো?

আমি। অর্থাৎ পাছে আমরা কিছু ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করি। অমরনাথবাবু বিজ্ঞ লোক দেখিতেছি। তা যা হৌক, এখন যে বড় দেখা দিলে?

রাজ। আপনার ঠাকুর আমাকে ডাকাইয়াছেন।

আমি। আমার ঠাকুর? তিনি তোমার সন্ধান পাইলেন কী প্রকারে?

রাজ। খুঁজিয়া খুঁজিয়া।

আমি। এত খোঁজাখুঁজি কেন? তোমায় বিষয় ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিবার জন্য নয় তো?

রাজ। না—না—তা কেন—তা কেন? আর একটা কথার জন্য। এখন রজনীর কিছু বিষয় হইয়াছে শুনিয়া অনেক সম্বন্ধ আসিতেছে। তা কোথায় সম্বন্ধ করি—তাই আপনাদের জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।

আমি। কেন, অমরনাথবাবুর সঙ্গে তো সম্বন্ধ হইতেছিল? তিনি এত করিয়া রজনীর বিষয় উদ্ধার করিলেন, তাঁকে ছাড়িয়া কাহাকে বিবাহ দিবে?

রাজ। যদি তাঁর অপেক্ষা ভালো পাত্র পাই?

আমি। অমরনাথের অপেক্ষা ভালো পাত্র কোথায় পাইবে?

রাজ। মনে করুন, আপনি যেমন, এমনই পাত্র যদি পাই?

আমি একটু চমকিলাম। বলিলাম, 'তাহা হইলে অমরনাথের অপেক্ষা ভালো পাত্র হইল না। কিন্তু ছেঁদো কথা ছাড়িয়া দেও—তুমি কি আমার সঙ্গে রজনীর সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছ?'

রাজচন্দ্র একটু কুণ্ঠিত হইল। বলিল, 'হাঁ তাই বটে। এ সম্বন্ধ করিতেই কর্তা আমাকে ডাকাইয়াছিলেন।'

শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলাম। সম্মুখে, দারিদ্র্যরাক্ষসকে দেখিয়া, ভীত হইয়া, পিতা-যে এই সম্বন্ধ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম—রজনীকে আমি বিবাহ করিলে ঘরের বিষয় ঘরে থাকিবে। আমাকে অন্ধ পুষ্পনারীর কাছে বিক্রয় করিয়া, পিতা বিক্রয়মূল্যস্বরূপ হৃত সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। শুনিয়া হাড় জ্বালিয়া গেল।

রাজচন্দ্রকে বলিলাম, 'তুমি এখন যাও। কর্তার সঙ্গে আমার সে-কথা হইবে।'

আমার রাগ দেখিয়া, রাজচন্দ্র পিতার কাছে গেল। সে কী বলিল, বলিতে পারি না। পিতা তাঁহাকে বিদায় দিয়া আমাকে ডাকাইলেন।

তিনি আমাকে নানাপ্রকারে অনুরোধ করিলেন—রজনীকে বিবাহ করিতেই হইবে। নহিলে সপরিবারে মারা যাইব—খাইব কী? তাঁহার দুঃখ ও কাতরতা দেখিয়া আমার দুঃখ হইল না। বড় রাগ হইল। আমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলাম।

পিতার কাছ হইতে গিয়া, আমার মার হাতে পড়িলাম। পিতার কাছে রাগ করিলাম, কিন্তু মার কাছে রাগ করিতে পারিলাম না—তাঁহার চক্ষের জল অসহ্য হইল। সেখান হইতে পলাইলাম। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা স্থির রহিল—যে-রজনীকে দয়া করিয়া গোপালের সঙ্গে বিবাহিত করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলাম—আজি তাহার টাকার লোভে তাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিব?

বিপদে পড়িয়া মনে করিলাম, ছোটমার সাহায্য লইব। গৃহের মধ্যে ছোটমা-ই বুদ্ধিমতী। ছোটমার কাছে গেলাম।

'ছোটমা, আমাকে কি রজনীকে বিবাহ করিতে হইবে? আমি কী অপরাধ করিয়াছি?'

ছোটমা চুপ করিয়া রহিলেন।

আমি। তুমিও কি ঐ পরামর্শে?

ছোটমা। বাছা, রজনী তো সৎকায়স্থের মেয়ে?

আমি। হইলই বা?

ছোটমা। আমি জানি, সে সচ্চরিত্রা।

আমি। তাহাও স্বীকার করি।

ছোটমা। সে পরম সুন্দরী।

আমি। পদ্মচক্ষু!

ছোটমা। বাবা—যদি পদ্মচক্ষুই খোঁজো, তবে তোমার আর-একটা বিবাহ করিতে কতক্ষণ?

আমি। সে কী মা! রজনীর টাকার জন্য রজনীকে বিবাহ করিয়া, তার বিষয় লইয়া, তার পর তাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া আর-একজনকে বিবাহ করা, কেমন কাজটা হইবে?

ছোটমা। ঠেলিয়া ফেলিবে কেন? তোমার বড়মা কি ঠেলা আছেন?

এ-কথার উত্তর ছোটমার কাছে করিতে পারা যায় না। তিনি আমার পিতার দ্বিতীয়পক্ষের বনিতা, বহুবিবাহের দোষের কথা তাঁহার সাক্ষাতে কী প্রকারে বলিব! সে-কথা না বলিয়া বলিলাম, 'আমি এ বিবাহ করিব না—তুমি আমার রক্ষা কর। তুমি সব পার।'

ছোটমা। আমি না বুঝি, এমন নহে। কিন্তু বিবাহ না করিলে, আমরা সপরিবারে অন্নাভাবে মারা যাইব। আমি সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমাদিগের অন্নকষ্ট আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না। তোমার সহস্র বৎসর পরমায়ু হউক, তুমি ইহাতে অমত করিও না।

আমি। টাকাই কি এতবড়?

ছোটমা। তোমার আমার কাছে নহে। কিন্তু যাঁহারা তোমার আমার সর্বস্ব, তাঁহাদের কাছে বটে। সুতরাং তোমার আমার কাছেও বটে! দেখ, তোমার জন্য আমরা তিনজনে প্রাণ দিতেও পারি। তুমি আমাদিগের জন্য একটি অন্ধকন্যা বিবাহ করিতে পারিবে না?

বিচারে ছোটমার কাছে হারিলাম। হারিলে রাগ বাড়ে। আমার রাগ বাড়িল। আমার মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, টাকার জন্য রজনীকে বিবাহ করা বড় অন্যায়। অতএব আমি দম্ভ করিয়া বলিলাম, 'তোমরা যাহাই বলো না কেন, আমি এ বিবাহ করিব না।'

ছোটমাও দম্ভ করিয়া বলিলেন, 'তুমিও যাই বলো না কেন, আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে তোমার এ বিবাহ দিবই দিব।'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'তবে বোধহয়, তুমি গোয়ালার মেয়ে। আমায় এ বিবাহ দিতে পারিবে না।'

ছোটমা বলিলেন, 'না বাবা, আমি কায়েতের মেয়ে।'

ছোটমা বড় দুষ্ট। আমাকে বাবা বলিয়া গালি ফিরাইয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমাদিগের বাড়িতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া মধ্যে মধ্যে থাকিত। কেহ সন্ন্যাসী বলিত, কেহ ব্রহ্মচারী, কেহ দণ্ডী, কেহ অবধূত। পরিধানে গৈরিক বাস, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, মস্তকে রুক্ষ কেশ, জটা নহে, রক্তচন্দনের ছোটরকমের ফোঁটা। বড় একটা ধূলাকাদার ঘটা নাই—সন্ন্যাসী জাতির মধ্যে ইনি একটু বাবু। খড়ম চন্দ্রকাষ্ঠের, তাহাতে হাতির দাঁতের বৌল। তিনি যাই হউন, বালকেরা তাঁহাকে সন্ন্যাসী মহাশয় বলিত বলিয়া আমিও তাঁহাকে তাহাই বলিব।

পিতা কোথা হইতে তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। অনুভবে বুঝিলাম, পিতার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, সন্ন্যাসী নানাবিধ ঔষধ জানে এবং তান্ত্রিক যাগযজ্ঞে সুদক্ষ। বিমাতা বন্ধ্যা।

পিতার অনুকম্পায় সন্ন্যাসী উপরের একটি বৈঠকখানা আসিয়া দখল করিয়াছিল। ইহা আমার একটু বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সন্ধ্যাকালে সূর্যের দিকে মুখ করিয়া সারঙ্গ রাগিণীতে আর্যাচ্ছন্দে স্তোত্র পাঠ করিত। ভণ্ডামি আর আমার সহ্য হইল না। আমি তাহার অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহার নিকটে গেলাম। বলিলাম, 'সন্ন্যাসীঠাকুর, ছাদের উপর মাথামুণ্ড কী বকিতেছিলে?'

সন্ন্যাসী হিন্দুস্থানী, কিন্তু আমাদিগের সঙ্গে যে-ভাষায় কথা কহিত, তাহার চৌদ্দআনা নিভাঁজ সংস্কৃত, একআনা হিন্দি, একআনা বাঙ্গালা। আমি বাঙ্গালাই রাখিলাম। সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, 'কেন, কী বকি, আপনি কি জানেন না?'

আমি বলিলাম, 'বেদমন্ত্র?'

স। হইলে হইতে পারে।

আমি। পড়িয়া কী হয়?

স। কিছু না।

উত্তরটুকু সন্ন্যাসীর জিত—আমি এটুকু প্রত্যাশা করি নাই। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তবে পড়েন কেন?'

স। কেন, শুনিতে কি কষ্টকর?

আমি। না, শুনিতে মন্দ নয়, বিশেষ আপনি সুকণ্ঠ। তবে যদি কিছু ফল নাই, তবে পড়েন কেন?'

স। যেখানে ইহাতে কাহারও কোনো অনিষ্ট নাই, সেখানে পড়ায় ক্ষতি কি?

আমি জারি করিতে আসিয়াছিলাম—কিন্তু দেখিলাম যে, একটু হটিয়াছি—সুতরাং আমাকে চাপিয়া ধরিতে হইল। বলিলাম, 'ক্ষতি নাই, কিন্তু নিষ্ফলে কেহ কোনো কাজ করে না—যদি বেদগান নিষ্ফল, তবে আপনি বেদগান করেন কেন?'

স। আপনিও তো পণ্ডিত, আপনিই বলুন দেখি, বৃক্ষের উপর কোকিল গান করে কেন?

ফাঁপরে পড়িলাম। ইহার দুইটি উত্তর আছে, এক—'ইহাতেই কোকিলের সুখ'—দ্বিতীয়, 'স্ত্রীকোকিলকে মোহিত করিবার জন্য।' কোন্‌টি বলি? প্রথমটি আগে বলিলাম, 'গাইয়াই কোকিলের সুখ।'

স। গাইয়াই আমার সুখ।

আমি। তবে টপ্পা, খেয়াল প্রভৃতি থাকিতে বেদগান করেন কেন?

স। কোন্ কথাগুলি সুখকর—সামান্যা গণিকাগণের কদর্য চরিত্রের গুণগান সুখকর, না দেবতাদিগের অসীম মহিমাগান সুখকর?

হারিয়া, দ্বিতীয় উত্তরে গেলাম। বলিলাম, 'কোকিল গায়, কোকিলপত্নীকে মোহিত করিবার জন্য, মোহনার্থ যে শারীরিক স্ফূর্তি, তাহাতে জীবের সুখ। কণ্ঠস্বরের স্ফূর্তি সেই শারীরিক স্ফূর্তির অন্তর্গত। আপনি কাহাকে মুগ্ধ করিতে চাহেন?'

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, 'আমার আপনার মনকে। মন আত্মার অনুরাগী নহে। আত্মার হিতকারী নহে। তাহাকে বশীভূত করিবার জন্য গাই।'

আমি। আপনারা দার্শনিক, মন এবং আত্মা পৃথক বলিয়া মানেন। কিন্তু মন একটি পৃথক, আত্মা একটি পৃথক পদার্থ, ইহা মানিতে পারি না। মনেরই ক্রিয়া দেখিতে পাই—ইচ্ছা, প্রবৃত্ত্যাদি আমার মনে। সুখ আমার মনে, দুঃখ আমার মনে। তবে আবার মনের অতিরিক্ত আত্মা, কেন মানিব? যাহার ক্রিয়া দেখি, তাহাকেই মানিব। যাহার কোনো চিহ্ন দেখি না, তাহাকে মানিব কেন?

স। তবে বলো না কেন, মন ও শরীর এক। শরীর ও মনের প্রভেদ কেন মানিব? যে কিছু কার্য করিতেছ, সকলই শরীরের কার্য—কোন্‌টি মনের কার্য?

আমি। চিন্তা প্রবৃত্তি ভোগাদি।

স। কিসে জানিলে, সে-সকল শারীরিক ক্রিয়া নহে?

আমি। তাহাও সত্য বটে। মন শরীরের ক্রিয়া* মাত্র।

স। ভালো, ভালো। তবে আর একটু এসো। বলো না কেন যে, শরীরও পঞ্চভূতের ক্রিয়া মাত্র? শুনিয়াছি, তোমরা পঞ্চভূত মানো না—তোমরা বহুভূতবাদী, তাই হউক; বলো না কেন, যে, ক্ষিত্যাদি বা অন্য ভূতগণ শরীররূপ ধারণ করিয়া সকলই করিতেছে? এই-যে তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ—আমি বলি যে, কেবল ক্ষিত্যাদি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শব্দ করিতেছে, শচীন্দ্রনাথ নহে। মন ও শরীরাদির কল্পনার প্রয়োজন কী? ক্ষিত্যাদি ভিন্ন শচীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব মানি না।

হারিয়া, ভক্তিভাবে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলাম। কিন্তু সেই অবধি সন্ন্যাসীর সঙ্গে একটু সম্প্রীতি হইল। সর্বদা তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতাম; এবং শাস্ত্রীয় আলাপ করিতাম। দেখিলাম, সন্ন্যাসীর অনেকপ্রকার ভণ্ডামি আছে। সন্ন্যাসী ঔষধ বিলায়, সন্ন্যাসী হাত দেখিয়া গণিয়া ভবিষ্যৎ বলে, সন্ন্যাসী যাগ-হোমাদিও মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকে—নল চালে, চোর বলিয়া দেয়, আরও কত ভণ্ডামি করে। একদিন আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, 'আপনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত; আপনার এ-সকল ভণ্ডামি কেন?'

স। কোন্‌টা ভণ্ডামি?

* Function of the brain.

আমি। এই নলচালা, হাতগণা প্রভৃতি।

স। কতকগুলা অনিশ্চিত বটে, কিন্তু তথাপি কর্তব্য।

আমি। যাহা অনিশ্চিত জানিতেছেন, তদ্দ্বারা লোককে প্রতারণা কেন করেন?

স। তোমরা মড়া কাটো কেন?

আমি। শিক্ষার্থ।

স। যাহারা শিক্ষিত, তাহারা কাটে কেন?

আমি। তত্ত্বানুসন্ধান জন্য।

স। আমরাও তত্ত্বানুসন্ধান জন্য এ-সকল করিয়া থাকি। শুনিয়াছি, বিলাতি পণ্ডিতের মধ্যে অনেকে বলেন, লোকের মাথার গঠন দেখিয়া তাহার চরিত্রের কথা বলা যায়। যদি মাথার গঠনে চরিত্র বলা যায়, তবে হাতের রেখা দেখিয়াই বা কেন না বলা যাইবে? ইহা মানি যে, হাতের রেখা দেখিয়া, কেহ এ-পর্যন্ত ঠিক বলিতে পারে নাই। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, ইহার প্রকৃত সঙ্কেত অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ক্রমে ক্রমে হাত দেখিতে দেখিতে প্রকৃত সঙ্কেত পাওয়া যাইতে পারে। এজন্য হাত পাইলেই দেখি।

আমি। আর নলচালা?

স। তোমরা লৌহের তারে পৃথিবীময় লিপি চালাইতে পার, আমরা কি নলটি চালাইতে পারি না? তোমাদের একটি ভ্রম আছে, তোমরা মনে কর যে, যাহা ইংরেজরা জানে, তাহাই সত্য; যাহা ইংরেজ জানে না, তাহা অসত্য, তাহা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত, তাহা অসাধ্য। বস্তুত তাহা নহে। জ্ঞান অনন্ত। কিছু তুমি জানো, কিছু আমি জানি, কিছু অন্যে জানে; কিন্তু কেহই বলিতে পারে না যে, আমি সব জানি—আর কেহ আমার জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু জানে না। কিছু ইংরেজ জানে, কিছু আমাদের পূর্বপুরুষেরা জানিতেন। ইংরেজরা যাহা জানে, ঋষিরা তাহা জানিতেন না, ঋষিরা যাহা জানিতেন, ইংরেজেরা এ-পর্যন্ত তাহা জানিতে পারে নাই। সেইসকল আর্যবিদ্যা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে; আমরা কেহ কেহ দুই-একটি বিদ্যা জানি। যত্নে গোপন রাখি—কাহাকেও শিখাই না।

আমি হাসিলাম। সন্ন্যাসী বলিলেন, 'তুমি বিশ্বাস করিতেছ না? কিছু প্রত্যক্ষ দেখিতে চাও?'

আমি বলিলাম, 'দেখিলে বুঝিতে পারি।'

সন্ন্যাসী বলিল, 'পশ্চাৎ দেখাইব। এক্ষণে তোমার সঙ্গে আমার একটি বিশেষ কথা আছে। আমার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া, তোমার পিতা আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তোমাকে বিবাহে প্রবৃত্তি দিই।'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'প্রবৃত্তি দিতে হইবে না। আমি বিবাহে প্রস্তুত—কিন্তু—'

স। কিন্তু কী?

আমি। কন্যা কই? এক কানা কন্যা আছে, তাহাকে বিবাহ করিব না।

স। এ বাঙ্গালাদেশে কি তোমার যোগ্যা কন্যা নাই?

আমি। হাজার হাজার আছে, কিন্তু বাছিয়া লইব কী প্রকারে? এই শতসহস্র

কন্যার মধ্যে কে আমাকে চিরকাল ভালোবাসিবে, তাহা কী প্রকারে বুঝিব?

স। আমার একটি বিদ্যা আছে। যদি পৃথিবীতে এমত কেহ থাকে যে, তোমাকে মর্মান্তিক ভালোবাসে, তবে তাহাকে স্বপ্নে দেখাইতে পারি। কিন্তু যে তোমাকে এখন ভালোবাসে না, ভবিষ্যতে বাসিতে পারে, তাহা আমার বিদ্যার অতীত।

আমি। এ বিদ্যা বড় আবশ্যক বিদ্যা নহে। যে যাহাকে ভালোবাসে, সে তাহাকে প্রায় প্রণয়শালী বলিয়া জানে।

স। কে বলিল? অজ্ঞাত প্রণয়ই পৃথিবীতে অধিক। তোমাকে কেহ ভালোবাসে? তুমি কি তাহাকে জানো?

আমি। আত্মীয়স্বজন ভিন্ন কেহ যে আমাকে বিশেষ ভালোবাসে, এমত জানি না।

স। তুমি আমাদের বিদ্যা কিছু প্রত্যক্ষ করিতে চাহিতেছিলে, আজ এইটি প্রত্যক্ষ কর।

আমি। ক্ষতি কী?

স। তবে শয়নকালে আমাকে শয্যাগৃহে ডাকিও।

আমার শয্যাগৃহ বহির্বাটীতে। আমি শয়নকালে সন্ন্যাসীকে ডাকাইলাম। সন্ন্যাসী আসিয়া আমাকে শয়ন করিতে বলিলেন। আমি শয়ন করিলে, তিনি বলিলেন, 'যতক্ষণ আমি এখানে থাকিব, চক্ষু চাহিও না। আমি গেলে যদি জাগ্রত থাকো, চাহিও।' সুতরাং আমি চক্ষু মুদিয়া রহিলাম—সন্ন্যাসী কী কৌশল করিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী যাইবার পূর্বেই আমি নিদ্রাভিভূত হইলাম।

সন্ন্যাসী বলিয়াছিল, পৃথিবীমধ্যে যে নায়িকা আমাকে মর্মান্তিক ভালোবাসে, অদ্য তাহাকেই আমি স্বপ্নে দেখিব। স্বপ্ন দেখিলাম বটে। কলকল গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে সৈকতভূমি; তাহার প্রান্তভাগে অর্ধজলমগ্না—কে?

রজনী

*　　　　*　　　　*

পরদিন প্রভাতে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলে?'

আমি। কানা ফুলওয়ালী।

স। কানা?

আমি। জন্মান্ধ।

স। আশ্চর্য! কিন্তু যেই হউক, তাহার অধিক পৃথিবীতে আর কেহ তোমাকে ভালোবাসে না।

আমি নীরব হইয়া রহিলাম।

চতুর্থ খণ্ড

সকলের কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ : লবঙ্গলতার কথা

বড় গোল বাধিল। আমি তো সন্ন্যাসীঠাকুরের হাতেপায়ে ধরিয়া, কাঁদিয়া কাঁটিয়া, শচীন্দ্রকে রজনীর বশীভূত করিবার উপায় করিতেছি। সন্ন্যাসী তন্ত্রসিদ্ধ; জগদম্বার কৃপায় যাহা মনে করেন, তাই করিতে পারেন। মিত্র মহাশয় ষষ্টি বৎসর বয়সে যে, এ পামরীর এত বশীভূত, তাহা আমার গুণে, কি সন্ন্যাসী ঠাকুরের গুণে, তাহা বলিয়া উঠা ভার; আমিও কায়মনোবাক্যে পতিপদসেবার ক্রটি করি না, ব্রহ্মচারীও আমার জন্য যাগ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র প্রয়োগে ক্রটি করেন না। যাহার জন্য যাহা তিনি করিয়াছেন, তাহা ফলিয়াছে। কামারবউর পিতলের টুক্‌নী সোনা করিয়া দিয়াছিলেন—উনি না পারেন কী? উহার মন্ত্রৌষধির গুণে শচীন্দ্র-যে রজনীকে ভালোবাসিবে—রজনীকে বিবাহ করিতে চাহিবে, তাহাতে আমার কোনো সন্দেহই নাই, কিন্তু তবু গোল বাধিয়াছে। গোলযোগ অমরনাথ বাধাইয়াছে। এখন শুনিতেছি অমরনাথের সঙ্গেই রজনীর বিবাহ স্থির হইয়াছে।

রজনীর মাসি মাসুয়া, রাজচন্দ্র এবং তাহার স্ত্রী, আমাদিগের দিকে। তাহার কারণ, কর্তা বলিয়াছেন, বিবাহ যদি হয় তবে তোমাদিগকে ঘটকবিদায়স্বরূপ কিছু দিব। কথাটা ঘটকবিদায়, কিন্তু আঁচটা দু-হাজার দশ-হাজার। কিন্তু তাহারা আমাদিগের দিকে হইলেও কিছু হইতেছে না। অমরনাথ ছাড়িতেছে না। সে নিশ্চয় রজনীকে বিবাহ করিবে, জিদ করিতেছে।

ভালো, অমরনাথ কে? মেয়ের বিবাহ দিবার কর্তা হইল তাহার মাসুয়া মাসি—বাপ মা বলাই উচিত—রাজচন্দ্র ও তাহার স্ত্রী, তাহারা যদি আমাদিগের দিকে, তবে অমরনাথের জিদে কী আসিয়া যায়? সে তাহাদিগকে বিষয় দেওয়াইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মেহনতানা দুই-চারি হাজার ধরিয়া দিলেই হইবে। আমার ছেলের বৌ করিব বলিয়া আমি যে-কন্যার সম্বন্ধ করিতেছি, অমরনাথ কি না তাহাকে বিবাহ করিতে চায়? অমরনাথের এ বড় স্পর্ধা! আমি একবার অমরনাথকে কিছু শিক্ষা দিয়াছি—আর একবার নাহয় কিছু দিব। আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে অমরনাথের নিকট হইতে এই রজনীকে কাড়িয়া লইয়া

আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিব।

আমি অমরনাথের সকল গুণ জানি। অমরনাথ অত্যন্ত ধূর্ত—তাহার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বড় সতর্ক হইয়া কাজ করিতে হয়। আমি সতর্ক হইয়াই কার্য আরম্ভ করিলাম।

প্রথমে রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন গা?'

মালীবৌ—রাজচন্দ্রের স্ত্রীকে আমরা আজিও মালীবৌ বলিতাম, রাগ না হইলে বরং বলিতাম না, রাগ হইলেই মালীবৌ বলিতাম—মালীবৌ বলিল, 'কি গা?'

আমি। মেয়ের বিয়ে নাকি অমরবাবুর সঙ্গে দিবে?

মালীবৌ। সেই কথাই তো এখন হচ্চে।

আমি। কেন হচ্চে? আমাদের সঙ্গে কী কথা হইয়াছিল?

মালীবৌ। কী করিব মা—আমি মেয়েমানুষ, অত কী জানি?

মাগীর মোটাবুদ্ধি দেখিয়া আমার বড় রাগ হইল—আমি বলিলাম, 'সে কী মালী বৌ? মেয়েমানুষে জানে না তো কি পুরুষমানুষে জানে? পুরুষমানুষ আবার সংসারধর্ম কুটুম্ব-কুটুম্বিতার কী জানে? পুরুষমানুষ মাথায় মোট করিয়া টাকা বহিয়া আনিয়া দিবে এই পর্যন্ত—পুরুষমানুষ আবার কর্তা নাকি?'

বোধহয়, মাগীর মোটাবুদ্ধিতে আমার কথাগুলো অসঙ্গত বোধ হইল—সে একটু হাসিল। আমি বলিলাম, 'তোমার স্বামীর কী মত—অমরনাথের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেন?'

মালীবৌ বলিল, 'তার মত নয়—তবে অমরনাথবাবু হইতেই রজনী বিষয় পাইয়াছে—তাঁর বাধ্য হইতেই হয়।'

আমি। তবে অমরনাথবাবুকে বলো গিয়া, বিষয় রজনী এখনও পায় নাই। বিষয় আমাদের; বিষয় আমরা ছাড়িব না। পার, তোমরা বিষয় মোকদ্দমা করিয়া লও গিয়া।

মালীবৌ। সে-কথা আগে বলিলেই হইত। এতদিনে মোকদ্দমা উপস্থিত হইত।

আমি। মোকদ্দমা করা মুখের কথা নহে। টাকার শ্রাদ্ধ। রাজচন্দ্র দাস ফুল বেচিয়া কত টাকা করিয়াছে?

মালীবৌ রাগে গরগর করিতে লাগিল। সত্য বলিতেছি, আমার কিছুই রাগ হয় নাই। মালীবৌ একটু রাগ সামলাইয়া বলিল, 'অমরবাবু আমার জামাই হইলেই বিষয় অমরবাবুর হইবে। তিনি টাকা দিয়া মোকদ্দমা করিতে পারেন, তাঁহার এমন শক্তি আছে।'

এই বলিয়া মালীবৌ উঠিয়া যায়, আমি তাহার আঁচল ধরিয়া বসাইলাম। মালীবৌ হাসিয়া বসিল। আমি বলিলাম, 'অমরবাবু মোকদ্দমা করিয়া বিষয় লইলে তোমার কী উপকার?'

মালী বৌ। আমার মেয়ের সুখ হবে।

আমি। আর আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে হলে বুঝি বড় দুঃখ হবে?

মালীবৌ। তা কেন? তবে যেখানে থাকে, আমার মেয়ে সুখী হইলেই হইল।

আমি। তোমাদের নিজের কিছু সুখ চাহি না?

মালীবৌ। আমাদের আবার কী সুখ? মেয়ের সুখেই আমাদের সুখ।

আমি। ঘটকালীটা?

মালীবৌ মুখ মুচকিয়া হাসিল। বলিল, 'আসল কথা বলিব মা ঠাকুরানি? এখানে বিয়ের মেয়ের মত নাই।'

আমি। সে কী! কী বলে?

মালীবৌ। এখানকার কথা হইলেই বলে, কানার আবার বিয়ের কাজ কী?

আমি। আর অমরনাথের সঙ্গে বিয়ের কথা হইলে?

মালীবৌ। বলে, ওঁ হতে আমাদের সব। উনি যা বলিবেন, তাই করিতে হইবে।

আমি। তা বিয়ের কন্যার আবার মতামত কী? মা-বাপের মতামত হইলেই হইল।

মালীবৌ। রজনী তো খুদে মেয়ে নয়, আর আমার পেটের সন্তানও নয়। আর বিষয় তার, আমাদের নয়। সে আমাদের হাঁকাইয়া দিলে আমরা কী করিতে পারি? বরং তার মত রাখিয়াই আমাদের এখন চলিতে হইতেছে।

আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'রজনীর সঙ্গে অমরনাথের দেখাশুনা হয় কি?'

মালীবৌ। না। অমরবাবু দেখা করেন না।

আমি। আমার সঙ্গে রজনীর একবার দেখা হয় নাকি?

মালীবৌ। আমারও তাই ইচ্ছা। আপনি যদি তাহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া তাহার মত করাইতে পারেন। আপনাকে রজনী বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করে।

আমি। তো চেষ্টা করিয়া দেখিব। কিন্তু রজনীর দেখা পাই কী প্রকারে? কাল তাহাকে এ-বাড়িতে একবার পাঠাইয়া দিতে পার?

মালীবৌ। তার আটক কী? সে তো এই বাড়িতেই খাইয়া মানুষ। কিন্তু যার বিয়ের সম্বন্ধ হইতেছে, তাহাকে কি শ্বশুরবাড়িতে অমন অদিনে অক্ষণে বিয়ের আগে আসিতে আছে?

মর মাগী! আবার কাচ! কী করি, আমি অন্য উপায় না-দেখিয়া বলিলাম, 'আচ্ছা, রজনী না আসিতে পারে, আমি একবার তোমাদের বাড়ি যাইতে পারি কি?'

মালীবৌ। সে কী! আমাদের কি এমন ভাগ্য হইবে যে, আপনার পায়ের ধূলা আমাদের বাড়িতে পড়িবে?

আমি। কুটুম্বিতা হইলে আমার কেন, অনেকেরই পড়িবে। তুমি আমাকে আজ নিমন্ত্রণ করিয়া যাও।

মালীবৌ। তা আমাদের বাড়িতে আপনাকে পাঠাইতে কর্তার মত হইবে কেন?

আমি। পুরুষমানুষের আবার মতামত কী? মেয়েমানুষের যে মত, পুরুষমানুষের সেই মত।

মালীবৌ জোড়হাত করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বিদায় গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অমরনাথের কথা

রজনীর সম্পত্তির উদ্ধার জন্য আমার এত কষ্ট সফল হইয়াছে, মিত্রেরাও নির্বিবাদে বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছে, তথাপি বিষয়ে দখল লওয়া হয় নাই, ইহা শুনিয়া অনেকে চমৎকৃত হইতে পারেন। তাহাতে আমিও কিছু বিস্মিত। বিষয় আমার নহে, আমি দখল লইবার কেহ নহি। বিষয় রজনীর, সে দখল না লইলে কে কী করিতে পারে? কিন্তু রজনী কিছুতেই বিষয়ে দখল লইতে সম্মত নহে। বলে—আজ নহে—আর দুই দিন যাক—পশ্চাৎ দখল লইবেন ইত্যাদি। দখল না লউক—কিন্তু দরিদ্রকন্যার ঐশ্বর্যে অত অনাস্থা কেন, আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। রাজচন্দ্র এবং রাজচন্দ্রের স্ত্রীও এ-বিষয়ে রজনীকে অনুরোধ করিয়াছে, কিন্তু রজনী বিষয়ে সম্প্রতি দখল লইতে চায় না। ইহার মর্ম কী? কাহার জন্য এত পরিশ্রম করিলাম?

ইহার যা হয়, একটা চূড়ান্ত স্থির করিবার জন্য আমি রজনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। রজনীর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা উত্থাপিত হওয়া অবধি আমি আর রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বড় যাইতাম না—কেননা, এখন আমাকে দেখিলে রজনী কিছু লজ্জিতা হইত। কিন্তু আজ না-গেলে নয় বলিয়া রজনীর কাছে গেলাম। সে-বাড়িতে আমার অবারিত দ্বার। আমি রজনীর সন্ধানে তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। ফিরিয়া আসিতেছি, এমত সময়ে দেখিতে পাইলাম, রজনী আর-একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে উপরে উঠিতেছে। সে-স্ত্রীলোককে দেখিয়াই চিনিলাম—অনেকদিন দেখি নাই, কিন্তু দেখিয়াই চিনিলাম যে, ঐ গজেন্দ্রগামিনী ললিতলবঙ্গলতা!

রজনী ইচ্ছাপূর্বক জীর্ণ বস্ত্র পরিয়াছিল, লজ্জায় সে লবঙ্গলতার সঙ্গে ভালো করিয়া কথা কহিতেছিল না। লবঙ্গলতা হাসিতে উছলিয়া পড়িতেছিল—রাগ বা বিদ্বেষের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না।

সে হাসি অনেকদিন শুনি নাই। সে হাসি তেমনই ছিল—পূর্ণিমার সমুদ্রে ক্ষুদ্র তরঙ্গের তুল্য, সপুষ্প বসন্তলতার আন্দোলন তুল্য—তাহা হইতে সুখ, ভাঙিয়া ভাঙিয়া, ঝরিয়া পড়িতেছিল।

আমি অবাক হইয়া নিস্পন্দশরীরে, সশঙ্কচিত্তে, এই বিচিত্রচরিত্রা রমণীর মানসিক শক্তির আলোচনা করিতেছিলাম। ললিতলবঙ্গলতা কিছুতেই টলে না। লবঙ্গলতা মহান ঐশ্বর্য হইতে দারিদ্র্যে পড়িয়াছে—তবু সেই সুখময় হাসি; যে রজনী হইতে এই ঘোর বিপদ্ ঘটিয়াছে, তাহারই গৃহে উঠিতেছে, তাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছে, তবু সেই সুখময় হাসি। আমি সম্মুখে—তবু সেই সুখময় হাসি! অথচ আমি জানি, লবঙ্গ কোনো কথাই ভুলে নাই।

আমি সরিয়া পার্শ্বের ঘরে গেলাম। লবঙ্গলতা প্রথমে সেই ঘরে প্রবেশ করিল—নিঃশঙ্কচিত্তে, আজ্ঞাদায়িনী রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় রজনীকে বলিল, 'রজনী—তুই এখন আর কোথাও যা! তোর বরের সঙ্গে আমার গোপনে কিছু কথা

আছে। ভয় নাই! তোর বর সুন্দর হলেও আমার বৃদ্ধ স্বামীর অপেক্ষা সুন্দর নহে।' রজনী অপ্রতিভ হইয়া, কী ভাবিতে ভাবিতে সরিয়া গেল।

ললিতলবঙ্গলতা, ভ্রূকুটি কুটিল করিয়া সেই মধুর হাসি হাসিয়া, ইন্দ্রাণীর মতো আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। একবার বৈ কেহ অমরনাথকে আত্মবিস্মৃত দেখে নাই। আবার আত্মবিস্মৃত হইলাম। সেবারও ললিতলবঙ্গলতা—এবার ললিতলবঙ্গলতা।

লবঙ্গ হাসিয়া বলিল, 'আমার মুখপানে চাহিয়া কী দেখিতেছ? তোমার অর্জিত ঐশ্বর্য কাড়িয়া লইতে আসিয়াছি কি না? মনে করিলে তাহা পারি।'

আমি বলিলাম, 'তুমি সব পার, কিন্তু ঐটি পার না। পারিলে কখনো রজনীকে বিষয় দিয়া, এখন স্বহস্তে রাঁধিয়া সতিনকে খাওয়াইবার বন্দোবস্ত করিতে না।'

লবঙ্গ উচ্চহাসি হাসিয়া বলিল, 'ওটা বুঝি বড় গায়ে লাগিবে মনে করেছ? সতিনকে রাঁধিয়া দিতে হয়, বড় দুঃখের কথা বটে; কিন্তু একটা পাহারাওয়ালাকে ডাকিয়া তোমাকে ধরাইয়া দিলে, এখনই আবার পাঁচটা রাঁধুনি রাখিতে পারি।'

আমি বলিলাম, 'বিষয় রজনীর; আমাকে ধরাইয়া দিলে কী হইবে? যাহার বিষয়, সে ভোগ করিতে থাকিবে।'

লবঙ্গ। তুমি কস্মিনকালে স্ত্রীলোক চিনিলে না। যাহাকে ভালোবাসে, তাহাকে রক্ষার জন্য রজনী এখনই বিষয় ছাড়িয়া দিবে।

আমি। অর্থাৎ আমার রক্ষার জন্য বিষয়টা তোমায় ঘুস দিবে।

লবঙ্গ। তাই।

আমি। তবে এতদিন সে ঘুস চাও নাই, আমাদিগের বিবাহ হয় নাই বলিয়া। বিবাহ হইলেই সে ঘুস চাহিবে।

লবঙ্গ। তোমার মতো ছোটলোক বুঝিবে কী প্রকারে? চোরেরা বুঝিতে পারে না যে, পরের দ্রব্য অস্পৃশ্য। রজনীর সম্পত্তি রাখিতে পারিলেও আমি রাখিব কেন?

আমি বলিলাম, 'তুমি যদি এমন না হবে, তবে আমার সে মরণকুবুদ্ধি ঘটিবে কেন? যদি আমার এত অপরাধ মার্জনা করিয়াছ, এত অনুগ্রহ করিয়াছ, তবে আর একটি ভিক্ষা আছে। যাহা জানো, তাহা যদি অন্যের কাছে না বলিয়াছ, তবে রজনীর কাছেও বলিও না।'

দর্পিতা লবঙ্গলতা ভ্রূভঙ্গি করিল—কী সুন্দর ভ্রূভঙ্গি! বলিল, 'আমি কি ঠক! যে তোমার স্ত্রী হইবে, তাহার কাছে তোমার নামে ঠকামো করিবার জন্য কি আমি তাহার বাড়িতে আসিয়াছি?'

এই বলিয়া লবঙ্গলতা হাসিল। তাহার হাসির মর্ম আমি কিছু কখনো বুঝিতে পারি না। লবঙ্গ বিলক্ষণ রাগিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু হাসিতে সব রাগ ভাসিয়া গেল। যেন জলের উপর হইতে মেঘের ছায়া সরিয়া গেল, তাহার উপর মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। আমি লবঙ্গলতার মর্ম কখনো বুঝিতে পারিলাম না।

হাসিয়া লবঙ্গ বলিল, 'তবে আমি রজনীর কাছে যাই?'

'যাও।'

ললিতলবঙ্গলতা, ললিত লবঙ্গলতার মতো দুলিতে দুলিতে চলিল। ক্ষণেক পরে

আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। গিয়া দেখিলাম, লবঙ্গলতা দাঁড়াইয়া আছে। রজনী তাহার পায়ে হাত দিয়া কাঁদিতেছে। আমি গেলে লবঙ্গলতা বলিল, 'শুন, তোমার ভবিষ্যৎ ভার্যা কী বলিতেছে! তোমার সম্মুখে নহিলে এমন কথা আমি কানে শুনিব না।'

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী?'

লবঙ্গলতা রজনীকে বলিল, 'বলো। তোমার বর আসিয়াছেন—'

রজনী সকাতরে অশ্রুপূর্ণলোচনে ললিতলবঙ্গলতার চরণস্পর্শ করিয়া বলিল, 'আমার এই ভিক্ষা, আমার যে-কিছু সম্পত্তি আছে, এই বাবুর যত্নে আমার যে সম্পত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, আমি লেখাপড়া করিয়া আপনাকে দান করিব, আপনি গ্রহণ করিবেন নাকি?'

আহ্লাদে আমার সর্বান্তঃকরণ প্লাবিত হইল—আমি রজনীর জন্য যে যত্ন করিয়াছিলাম—যে ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলাম—তাহা সার্থক বোধ হইল। আমি পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম, এখন আরও পরিষ্কার বুঝিলাম যে, রমণীকুলে, অন্ধ রজনী অদ্বিতীয় রত্ন! লবঙ্গলতার প্রোজ্জ্বল জ্যোতিও তাহার কাছে ম্লান হইল। আমি ইতিপূর্বেই রজনীর অন্ধনয়নে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—আজি তাহার কাছে বিনামূল্যে বিক্রীত হইলাম। এই অমূল্য রত্নে আমার অন্ধকারপুরী প্রভাসিত করিয়া, এ জীবন সুখে কাটাইব। বিধাতা আমার কি সে দিন করিবেন না!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : লবঙ্গলতার কথা

আমি মনে করিয়াছিলাম, রজনীর এই বিস্ময়কর কথা শুনিয়া অমরনাথ আগুনে সেঁকা কলাপাতার মতো শুকাইয়া উঠিবে। কই, তাহা তো কিছুই দেখিলাম না। তাহার মুখ না-শুকাইয়া বরং প্রফুল্ল হইল। বিস্মিত হতবুদ্ধি, যা হইবার, তাহা আমিই হইলাম।

আমি প্রথম তামাশা মনে করিলাম, কিন্তু রজনীর কাতরতা, অশ্রুপাত এবং দার্ঢ্য দেখিয়া আমার নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিল যে, রজনী আন্তরিক বলিতেছে। আমি বলিলাম, 'রজনী! কায়েতের কুলে তুমিই ধন্য! তোমার মতো কেহ নাই। কিন্তু আমি তোমার দান গ্রহণ করিব না।'

রজনী বলিল, 'না গ্রহণ করেন, আমি ইহা বিলাইয়া দিব।'

আমি। অমরনাথবাবুকে?

রজনী। আপনি উঁহাকে সবিশেষ চিনেন না; আমি দিলেও উনি লইবেন না। লইবার অন্য লোক আছে।

আমি। অমরনাথবাবু কী বলো?

অমর। আমার সঙ্গে কোনো কথা হইতেছে না, আমি কী বলিব?

আমি বড় ফাঁপরে পড়িলাম; রজনী-যে-বিষয় ছাড়িয়া দিতেছে, তাহাতে বিস্মিত; আবার অমরনাথ যে-বিষয় উদ্ধারের জন্য এত করিযাছিল, যাহার লোভে রজনীকে

বিবাহ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে, সে-বিষয় হাতছাড়া হইতেছে, দেখিয়াও সে প্রফুল্ল। কাণ্ডখানা কী?

আমি অমরনাথকে বলিলাম যে, যদি স্থানান্তরে যাও, তবে আমি রজনীর সঙ্গে সকল কথা মুখ ফুটিয়া কই। অমরনাথ অমনি সরিয়া গেল। আমি তখন রজনীকে বলিলাম, 'সত্য সত্যই কি তুমি বিষয় বিলাইয়া দিবে?'

'সত্য সত্য। আমি গঙ্গাজল নিয়া শপথ করিয়া বলিতেছি।'

আমি। আমি তোমার দান লই, তুমি যদি আমার কিছু দান লও।

রজনী। অনেক লইয়াছি।

আমি। আরও কিছু লইতে হইবে।

রজনী। একখানি প্রসাদি কাপড় দিবেন।

আমি। তা না। আমি যা দিই, তাই নিতে হইবে।

রজনী। কী দিবেন?

আমি। শচীন্দ্র বলিয়া আমার একটি পুত্র আছে। আমি তোমাকে শচীন্দ্র দান করিব। স্বামিস্বরূপ তুমি তাহাকে গ্রহণ করিবে। তুমি যদি তাহাকে গ্রহণ কর, তবেই আমি তোমার বিষয় গ্রহণ করিব।

রজনী দাঁড়াইয়াছিল, ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া, অন্ধনয়ন মুদিল। তারপর তাহার মুদিত নয়ন হইতে অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল—চক্ষের জল আর ফুরায় না। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। রজনী কথা কহে না—কেবল কাঁদে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি রজনী! অত কাঁদো কেন?'

রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'সেদিন গঙ্গার জলে আমি ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলাম—ডুবিয়াছিলাম, লোকে ধরিয়া তুলিল। সে শচীন্দ্রের জন্য। তুমি যদি বলিতে, তুমি অন্ধ, তোমার চক্ষু ফুটাইয়া দিব—আমি তাহা চাহিতাম না—আমি শচীন্দ্র চাহিতাম। শচীন্দ্রের অপেক্ষা এ-জগতে আর কিছুই নাই—আমার প্রাণ তাঁহার কাছে, দেবতার কাছে ফুলের কলিমাত্র—শ্রীচরণে স্থান পাইলেই সার্থক। অন্ধের দুঃখের কথা শুনিবে কি?'

আমি রজনীর কাতরতা দেখিয়া কাতর হইয়া বলিলাম, 'শুনিব।'

তখন রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় খুলিয়া আমার কাছে সকল কথা বলিল। শচীন্দ্রের কণ্ঠ, শচীন্দ্রের স্পর্শ, অন্ধের রূপোন্মাদ! তাহার পলায়ন, নিমজ্জন, উদ্ধার সকল বলিল। বলিয়া বলিল, 'ঠাকুরানি, তোমাদের চক্ষু আছে—চক্ষু থাকিলে এত ভালোবাসা বাসিতে পারে কি?'

মনে মনে বলিলাম, 'কানি! তুই ভালোবাসার কী জানিস! তুমি লবঙ্গলতার অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী।' প্রকাশ্যে বলিলাম, 'না, রজনী, আমার বুড়া স্বামী—আমি অতশত জানি না। তুমি শচীন্দ্রকে তবে বিবাহ করিবে, ইহা স্থির?'

রজনী বলিল, 'না।'

আমি। সে কী! তবে এত কথা কী বলিতেছিলে—এত কাঁদিলে কেন?

রজনী। আমার সে-সুখ কপালে নাই বলিয়াই এত কাঁদিলাম।

আমি। সে কী! আমি বিবাহ দিব।

রজনী। দিতে পারিবেন না। অমরনাথ হইতে আমার সর্বস্ব। অমরনাথ আমার বিষয় উদ্ধারের জন্য যাহা করিয়াছেন, পরের জন্য পরে কি তত করে? তাও ধরি না, তিনি আপনার প্রাণ দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।

রজনী সে-বৃত্তান্ত বলিল। পরে কহিল, 'যাঁহার কাছে আমি এত ঋণী, তিনি আমার যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তিনি যখন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দাসী করিতে চাহিয়াছেন, তখন আমি তাঁহারই দাসী হইব, আর কাহারও নহে।'

হরি! হরি! কেন বাছাকে সন্ন্যাসী দিয়া ঔষধ করিলাম! বিবাহ ব্যতীতও বিষয় থাকে—রজনী তো এখনই বিষয় দিতে চাহিতেছে। কিন্তু ছি! রজনীর দান লইব? ভিক্ষা মাগিয়া খাইব—সেও ভালো। আমি বলিয়াছি—আমি যদি এই বিবাহ না দিই তো আমি কায়েতের মেয়ে নই। আমি এ বিবাহ দিবই দিব। আমি রজনীকে বলিলাম, 'তবে আমি তোমার দান লইব না। তুমি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দান করিও।' আমি উঠিলাম।

রজনী বলিল, 'আর একবার বসুন। আমি অমরনাথবাবুর দ্বারা একবার অনুরোধ করাইব। তাঁহাকে ডাকিতেছি।'

অমরনাথের সঙ্গে আর-একবার সাক্ষাৎ আমারও ইচ্ছা। আমি আবার বসিলাম। রজনী অমরনাথকে ডাকিল।

অমরনাথ আসিলে, আমি রজনীকে বলিলাম, 'অমরনাথবাবু এ-বিষয়ে যদি অনুরোধ করিতে চাহেন, তবে সকল কথা কি তোমার সাক্ষাতে খুলিয়া বলিতে পারিবেন? আপনার প্রশংসা আপনি দাঁড়াইয়া শুনিও না।'

রজনী সরিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : লবঙ্গলতার কথা

আমি অমরনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কি রজনীকে বিবাহ করিবে?'

অ। করিব—স্থির।

আমি। এখনও স্থির? রজনীর বিষয় তো রজনী আমাকে দিতেছে।

অ। আমি রজনীকে বিবাহ করিব—বিষয় বিবাহ করিব না।

আমি। বিষয়ের জন্যই তো রজনীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে?

অ। স্ত্রীলোকের মন এমনই কদর্য।

আমি। আমাদের উপর এত অভক্তি কত দিন?

অ। অভক্তি নাই—তাহা হইলে বিবাহ করিতে চাহিতাম না।

আমি। কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া অন্ধকন্যাতে এত অনুরাগ কেন? তাই বিষয়ের কথা বলিতেছিলাম।

অ। তুমি বৃদ্ধতে এত অনুরক্ত কেন? বিষয়ের জন্য কি?

আমি। কাহারও সাক্ষাতে তাহার স্বামীকে বুড়া বলিতে নাই। আমার সঙ্গে

রাগারাগি কেন? তুমি কি মুখরা স্ত্রীলোকের মুখকে ভয় কর না?

(কিন্তু রাগারাগি আমার আন্তরিক বাসনা)

অমরনাথ বলিল, 'ভয় করি বই কি? রাগের কথা কিছু বলি নাই। তুমি মিত্রজাকে ভালোবাস, আমিও রজনীকে তেমনি ভালোবাসি।'

আমি। কটাক্ষের গুণে নাকি?

অ। না। কটাক্ষ নাই বলিয়া। তুমিও কানা হইলে আরও সুন্দর হইতে।

আমি। সে-কথা মিত্রজাকে জিজ্ঞাসা করিব, তোমাকে নহে। সম্প্রতি তুমিও যেমন রজনীকে ভালোবাস, আমিও রজনীকে তেমনি ভালোবাসি।

অ। তুমিও রজনীকে বিবাহ্ করিতে চাও নাকি?

আমি। প্রায়। আমি নিজে তাহাকে বিবাহ না করি, তাহার ভালো বিবাহ দিতে চাই। তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে হইতে দিব না।

অ। আমি সুপাত্র। রজনীর এরূপ আর জুটিতেছে না।

আমি। তুমি কুপাত্র। আমি সুপাত্র জোটাইয়া দিব।

অ। আমি কুপাত্র কিসে?

আমি। কামিজটা খুলিয়া পিঠ বাহির কর দেখি?

অমরনাথের মুখ শুকাইয়া কালো হইয়া গেল। অতি দুঃখিতভাবে বলিল, 'ছি! লবঙ্গ!'

আমার দুঃখ হইল, কিন্তু দুঃখ দেখিয়া ভুলিলাম না। বলিলাম, 'একটি গল্প বলিব শুনিবে?'

আমি কথা চাপা দিতেছি মনে করিয়া অমরনাথ বলিল, 'শুনিব।'

আমি তখন বলিতে লাগিলাম, 'প্রথম যৌবনকালে লোকে আমাকে রূপবতী বলিত—'

অ। এটা যদি গল্প, তবে সত্য কোন্ কথা?

আমি। পরে শোনো। সেই রূপ দেখিয়া এক চোর মুগ্ধ হইয়া, আমার পিত্রালয়ে, যে-ঘরে আমি এক পরিচারিকা সঙ্গে শয়ন করিয়াছিলাম, সেই ঘরে সিঁধ দিল।

এই কথা বলিতে আরম্ভ করায়, অমরনাথ গলদ্ঘর্ম হইয়া উঠিল। বলিল, 'ক্ষমা কর।'

আমি বলিতে লাগিলাম, 'সেই চোর সিঁধপথে আমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল—আমি চোরকে চিনিলাম। ভীতা হইয়া পরিচারিকাকে উঠাইলাম। সে চোরকে চিনিত না। আমি তখন অগত্যা, চোরকে আদর করিয়া আশ্বস্ত করিয়া পালঙ্কে বসাইলাম।'

অমর। ক্ষমা কর, সে তো সকলই জানি।

আমি। তবু একবার স্মরণ করিয়া দেওয়া ভালো। ক্ষণেক পরে, চোরের অলক্ষ্যে আমার সঙ্কেতানুসারে পরিচারিকা বাহিরে গিয়া দ্বারবান্‌কে ডাকিয়া লইয়া সিঁধমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আমিও সময় বুঝিয়া, বাহিরে প্রয়োজন ছলনা করিয়া নির্গত হইয়া, বাহির হইতে একমাত্র দ্বারের শৃঙ্খল বদ্ধ করিলাম। মন্দ করিয়াছিলাম?

অমরনাথ বলিল, 'এ-সকল কথা কেন?'

আমি। পরে চোর নির্গত হইল কী প্রকারে বলো দেখি? ডাকিয়া পাড়ার লোক জমা করিলাম। বড় বড় বলবান আসিয়া চোরকে ধরিল। চোর লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়া রহিল। আমি দয়া করিয়া তাহার মুখের কাপড় খুলাইলাম না, কিন্তু স্বহস্তে লোহার শলা তপ্ত করিয়া তাহার পিঠে লিখিয়াছিলাম—

'চোর!'

অমরবাবু, অতি গ্রীষ্মেও কি আপনি গায়ের জামা খুলিয়া শয়ন করেন না?

অ। না।

আমি। লবঙ্গলতার হস্তাক্ষর মুছিবার নহে। আমি রজনীকে ডাকিয়া এই গল্প শুনাইয়া যাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শুনাইব না। তুমি রজনীর যোগ্য নহে, রজনীকে বিবাহ করিতে চেষ্টা পাইও না। যদি ক্ষান্ত না হও, তবে সুতরাং শুনাইতে বাধ্য হইব।

অমরনাথ কিছুক্ষণ ভাবিল। পরে দুঃখিতভাবে বলিল, 'শুনাইতে হয় শুনাইও। তুমি শুনাও বা না-শুনাও, আমি স্বয়ং আজি তাহাকে সকল শুনাইব। আমার দোষ-গুণ সকল শুনিয়া রজনী আমাকে গ্রহণ করিতে হয়, গ্রহণ করিবে; না করিতে হয়, না করিবে। আমি তাহাকে প্রবঞ্চনা করিব না।'

আমি হারিয়া, মনে মনে অমরনাথকে শত শত ধন্যবাদ করিতে করিতে, হর্ষবিষাদে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : শচীন্দ্রনাথের কথা

ঐশ্বর্য হারাইয়া, কিছুদিন পরে আমি পীড়িত হইলাম। ঐশ্বর্য হইতে দারিদ্র্যে পতনের আশঙ্কায় মনে কোনো বিকার উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া, কি কীজন্য এই পীড়ার উৎপত্তি, তাহা আমি বলিবার কোনো চেষ্টা পাইব না। কেবল পীড়ার লক্ষণ বলিব।

সন্ধ্যার পূর্বে রৌদ্রের তাপ অপনীত হইলে পর, প্রাসাদের উপর বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলাম। সমস্ত দিবস অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। জগতের দুরূহ গূঢ় তত্ত্বসকলের আলোচনা করিতেছিলাম। কিছুরই মর্ম বুঝিতে পারি না, কিন্তু কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি পায় না। যত পড়ি, তত পড়িতে সাধ করে। শেষ শ্রান্তি বোধ হইল। পুস্তক বন্ধ করিয়া হস্তে লইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলাম। একটু নিদ্রা আসিল—অথচ নিদ্রা নহে। সে মোহ, নিদ্রার ন্যায় সুখকর বা তৃপ্তিজনক নহে। ক্লান্ত হস্ত হইতে পুস্তক খসিয়া পড়িল। চক্ষু চাহিয়া আছি—বাহ্যবস্তু সকলই দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু কী দেখিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। অকস্মাৎ সেইখানে প্রভাতবীচিবিক্ষেপচপলা কলকলনাদিনী নদী বিস্তৃতা দেখিলাম—যেন তথা ঊষার উজ্জ্বল বর্ণে পূর্বদিক প্রভাসিত হইতেছে—দেখি, সেই গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে সৈকতমূলে রজনী! রজনী জলে নামিতেছে। ধীরে, ধীরে, ধীরে! অন্ধ! অথচ কুঞ্চিত ভ্রূ; বিকলা

অথচ স্থিরা; সেই প্রভাতশান্তিশীতলা ভাগীরথীর ন্যায় গম্ভীরা, ধীরা, সেই ভাগীরথীর ন্যায় অন্তরে দুর্জয় বেগশালিনী! ধীরে, ধীরে, ধীরে,—জলে নামিতেছে। দেখিলাম কী সুন্দর! রজনী কী সুন্দরী! বৃক্ষ হইতে নবমঞ্জরীর সুগন্ধের ন্যায়, দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষভাগের ন্যায়, রজনী জলে, ধীরে—ধীরে—ধীরে নামিতেছে! ধীরে রজনী! ধীরে! আমি দেখি তোমায়। তখন অনাদর করিয়া দেখি নাই, এখন একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লই। ধীরে, রজনী ধীরে!

আমার মূর্ছা হইল। মূর্ছার লক্ষণ-সকল আমি অবগত নহি। যাহা পশ্চাৎ শুনিয়াছি, তাহা বলিয়া কোনো ফল নাই। আমি যখন পুনর্বার চেতনাপ্রাপ্ত হইলাম, তখন রাত্রিকাল—আমার নিকট অনেক লোক। কিন্তু আমি সে-সকল কিছুই দেখিলাম না। আমি দেখিলাম—কেবল সেই মৃদুনাদিনী গঙ্গা, আর সেই মৃদুগামিনী রজনী, ধীরে, ধীরে, ধীরে জলে নামিতেছে। চক্ষু মুদিলাম, তবু দেখিলাম, সেই গঙ্গা, আর সেই রজনী। আবার চাহিলাম, আবার দেখিলাম সেই গঙ্গা আর সেই রজনী! দিগন্তরে চাহিলাম—আবার সেই রজনী, ধীরে, ধীরে, ধীরে, জলে নামিতেছে। ঊর্ধ্বে চাহিলাম—ঊর্ধ্বেও আকাশবিহারিণী গঙ্গা ধীরে, ধীরে, ধীরে বহিতেছে; আর আকাশবিহারিণী রজনী ধীরে, ধীরে, ধীরে নামিতেছে। অন্যদিকে মন ফিরাইলাম; তথাপি সেই গঙ্গা আর সেই রজনী। আমি নিরস্ত হইলাম। চিকিৎসকেরা আমার চিকিৎসা করিতে লাগিল।

অনেকদিন ধরিয়া আমার এই চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু আমার নয়নাগ্র হইতে রজনীরূপ তিলেক জন্য অন্তর্হিত হইল না। আমি জানি না, আমার কী রোগ বলিয়া চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করিতেছিল। আমার নয়নাগ্রে যে রূপ অহরহ নাচিতেছিল, তাহার কথা কাহাকেও বলি নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : শচীন্দ্রের কথা

ওহে ধীরে, রজনি ধীরে! ধীরে, ধীরে, আমার এই হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ কর! এত দ্রুতগামিনী কেন? তুমি অন্ধ, পথ চেনো না, ধীরে, রজনি ধীরে! ক্ষুদ্রা এই পুরী, আঁধার, আঁধার, আঁধার! চিরান্ধকার! দীপশলাকার ন্যায় ইহাতে প্রবেশ করিয়া আলো কর;—দীপশলাকার ন্যায় আপনি পুড়িবে, কিন্তু এ আঁধার পুরী আলো করিবে।

ওহে ধীরে, রজনি ধীরে! এ পুরী আলো কর, কিন্তু দাহ কর কেন? কে জানে যে, শীতল প্রস্তরেও দাহ করিবে—তোমায় তো পাষাণগঠিতা, পাষাণময়ী জানিতাম; কে জানে যে, পাষাণেও দাহ করিবে? অথবা কে জানে, পাষাণেও লৌহের সংঘর্ষণেই অগ্ন্যুৎপাত হয়। তোমার প্রস্তরধবল, প্রস্তরস্নিগ্ধদর্শন, প্রস্তরগঠিতবৎ মূর্তি যত দেখি, ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়। অনুদিন, পলকে পলকে, দেখিয়াও মনে হয়, দেখিলাম কই? আবার দেখি। আবার দেখি, কিন্তু দেখিয়া তো সাধ মিটিল না।

পীড়িতাবস্থায় আমি প্রায় কাহারও সঙ্গে কথা কহিতাম না। কেহ কথা কহিতে আসিলে ভালো লাগিত না। রজনীর কথা মুখে আনিতাম না—কিন্তু প্রলাপকালে কী

বলিতাম না বলিতাম, তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। প্রলাপ সচরাচরই ঘটিত।

শয্যা প্রায় ত্যাগ করিতাম না। শুইয়া শুইয়া কত কী দেখিতাম, তাহা বলিতে পারি না। কখনো দেখিতাম, সমরক্ষেত্রে যবননিপাত হইতেছে—রক্তে নদী বহিতেছে; কখনো দেখিতাম, সুবর্ণপ্রান্তরে হীরকবৃক্ষে স্তবকে স্তবকে নক্ষত্র ফুটিয়া আছে। কখনো দেখিতাম আকাশমার্গে, অষ্টশশিসমন্বিত শনৈশ্চর মহাগ্রহ চতুশ্চন্দ্রবাহী বৃহস্পতির উপর মহাবেগে পতিত হইল—গ্রহ-উপগ্রহ-সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙিয়া গেল—আঘাতোৎপন্ন বহ্নিতে সে-সকল জ্বলিয়া উঠিয়া, দাহ্যমানাবস্থাতে মহাবেগে বিশ্বমণ্ডলের চতুর্দিকে প্রধাবিত হইতেছে। কখনো দেখিতাম, এই জগৎ, জ্যোতির্ময় কান্তরূপধর দেবযোনির মূর্তিতে পরিপূর্ণ; তাহারা অবিরত অম্বরপথ প্রভাসিত করিয়া বিচরণ করিতেছে; তাহাদিগের অঙ্গের সৌরভে আমার নাসারন্ধ্র পরিপূর্ণ হইতেছে। কিন্তু যাহাই দেখি না—সকলের মধ্যস্থলে রজনীর সেই প্রস্তরময়ী মূর্তি দেখিতে পাইতাম। হায় রজনী! পাথরে এত আগুন!

ধীরে, রজনি, ধীরে! ধীরে, ধীরে, রজনি, ঐ অন্ধ নয়ন উন্মীলিত কর। দেখ, আমায় দেখ, আমি তোমায় দেখি! ঐ দেখিতেছি—তোমার নয়নপদ্ম ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতেছে—ক্রমে, ক্রমে, ক্রমে, ধীরে, ধীরে, ধীরে,ধীরে, নয়নরাজীব ফুটিতেছে! এ সংসারে কাহার না নয়ন আছে? গো, মেষ, কুক্কুর, মার্জার ইহাদিগেরও নয়ন আছে—তোমার নাই? নাই, নাই, তবে আমারও নাই! আমিও আর চক্ষু চাহিব না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : লবঙ্গলতার কথা

আমি জানিতাম, শচীন্দ্র একটা কাণ্ড করিবে—ছেলেবয়সে অত ভাবিতে আছে? দিদি তো একবার ফিরে চেয়েও দেখেন না—আমি বলিলে বিমাতা বলিয়া আমার কথা গ্রাহ্য করে না। ওসব ছেলেকে আঁটিয়া উঠা ভার। এখন দায় দেখিতেছি আমার। ডাক্তার বৈদ্য কিছু করিতে পারিল না—পারিবেও না। তারা রোগই নির্ণয় করিতে জানে না। রোগ হল মনে—হাত দেখিলে, চোখ দেখিলে, জিভ দেখিলে তাহা কি বুঝিবে? যদি তারা আমার মতো আড়ালে লুকাইয়া বসিয়া আড়ি পেতে ছেলের কাণ্ড দেখত, তবে একদিন রোগের ঠিকানা করিলে করিতে পারিত।

কথাটা কী? 'ধীরে, রজনি!' ছেলে তো একেলা থাকিলেই এই কথাই বলে। সন্ন্যাসীঠাকুরের ঔষধে কি এই ফল ফলিল? আমার মাথা খাইতে কেন আমি এমন কাজ করিলাম? ভালো, রজনীকে একবার রোগীর কাছে বসাইয়া রাখিলে হয় না? কই, আমি রজনীর বাড়ি গিয়াছিলাম, সে তো সেই অবধি আমার বাড়ি একবারও আসে নাই! ডাকিয়া পাঠাইলে না-আসিয়া থাকিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া আমি রজনীর গৃহে লোক পাঠাইলাম—বলিয়া পাঠাইলাম যে, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, একবার আসিতে বলিও।

মনে করিলাম, আগে একবার শচীন্দ্রের কাছে রজনীর কথা পাড়িয়া দেখি। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের পীড়ার কোনো সম্বন্ধ আছে কি না?

অতএব প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য শচীন্দ্রের কাছে গিয়া বসিলাম। এ-কথা ও-কথার পর রজনীর প্রসঙ্গ ছলে পাড়িলাম। আর কেহ সেখানে ছিল না। রজনীর নাম শুনিবামাত্র বাছা অমনি, চমকিত হংসীর ন্যায় গ্রীবা তুলিয়া আমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। আমি যত রজনীর কথা বলিতে লাগিলাম, শচীন্দ্র কিছুই উত্তর করিল না, কিন্তু ব্যাকুলিত চক্ষে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। ছেলে বড় অস্থির হইয়া উঠিল—এটা পাড়ে, সেটা ভাঙে, এইরূপ আরম্ভ করিল। আমি পরিশেষে রজনীকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম; সে অত্যন্ত ধনলুব্ধা, আমাদিগের পূর্বকৃত উপকার কিছুমাত্র স্মরণ করিল না। এইরূপ কথাবার্তা শুনিয়া শচীন্দ্র অপ্রসন্নভাবাপন্ন হইল, এমন আমার বোধ হইল, কিন্তু কথায় কিছু প্রকাশ পাইল না।

নিশ্চয় বুঝিলাম, এটি সন্ন্যাসীর কীর্তি। তিনি এক্ষণে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, অল্পদিনে আসিবার কথা ছিল। তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাও মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, তিনিই বা কী করিবেন? আমি নির্বোধ দুরাকাঙ্ক্ষাপরবশ স্ত্রীলোক—ধনের লোভে অগ্রপশ্চাৎ না-ভাবিয়া আপনিই এই বিপত্তি উপস্থিত করিয়াছি! তখন মনে জানিতাম যে, রজনীকে নিশ্চয়ই পুত্রবধূ করিব। তখন কে জানে যে, কানা ফুলওয়ালীও দুর্লভ হইবে? কে জানে যে, সন্ন্যাসীর মন্ত্রৌষধে হিতে বিপরীত হইবে? স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র, তাহা জানিতাম না; আপনার বুদ্ধির অহঙ্কারে মজিলাম। আমার এমন বুদ্ধি হইবার আগে, আমি মরিলাম না কেন? এখন ইচ্ছা হইতেছে মরি, কিন্তু শচীন্দ্রবাবুর আরোগ্য না-দেখিয়া মরিতে পারিতেছি না।

কিছুদিন পরে কোথা হইতে সেই পূর্বপরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, তিনি শচীন্দ্রের পীড়া শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন। কে তাঁহাকে শচীন্দ্রের পীড়ার সংবাদ দিল, তাহা কিছু বলিলেন না।

শচীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিলেন। পরে শচীন্দ্রের কাছে বসিয়া নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রণাম করিবার জন্য আমি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। প্রণাম করিয়া, মঙ্গল জিজ্ঞাসার পর বলিলাম, 'মহাশয় সর্বজ্ঞ; না জানেন, এমন তত্ত্বই নাই। শচীন্দ্রের কী রোগ, আপনি অবশ্য জানেন।'

তিনি বলিলেন, 'উহা বায়ুরোগ। অতি দুশ্চিকিৎস্য।'

আমি বলিলাম, 'তবে শচীন্দ্র সর্বদা রজনীর নাম করে কেন?'

সন্ন্যাসী বলিলেন, 'তুমি বালিকা, বুঝিবে কী? (কী সর্বনাশ, আমি বালিকা! আমি শচীর মা!) এই রোগের এক গতি এই যে, হৃদয়স্থ লুক্কায়িত এবং অপরিচিত ভাব বা প্রবৃত্তিসকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং অত্যন্ত বলবান হইয়া উঠে। শচীন্দ্র কদাচিৎ আমাদিগের দৈববিদ্যাসকলের পরীক্ষার্থী হইলে, আমি কোনো তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করিলাম, তাহাতে যে তাঁহাকে আন্তরিক ভালোবাসে, তিনি তাহাকে স্বপ্নে দেখিবেন। শচীন্দ্র রাত্রিযোগে রজনীকে স্বপ্নে দেখিলেন। স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে আমাদিগকে ভালোবাসে বুঝিতে পারি, আমরা তাহার প্রতি অনুরক্ত হই। অতএব সেই রাত্রে শচীন্দ্রের মনে রজনীর প্রতি অনুরাগের বীজ গোপনে সমারোপিত হইল। কিন্তু রজনী অন্ধ, এবং ইতর লোকের কন্যা, ইত্যাদি কারণে সে-অনুরাগ পরিস্ফুট

হইতে পারে নাই। অনুরাগের লক্ষণ স্বহৃদয়ে কিছু দেখিতে পাইলেও শচীন্দ্র তৎপ্রতি বিশ্বাস করেন নাই। ক্রমে ঘোরতর দারিদ্র্যদুঃখের আশঙ্কা তোমাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিল। সর্বাপেক্ষা শচীন্দ্রই তাহাতে গুরুতর ব্যথা পাইলেন। অন্যমনে, দারিদ্র্যদুঃখ ভুলিবার জন্য শচীন্দ্র অধ্যয়নে মন দিলেন। অনন্যমনা হইয়া বিদ্যালোচনা করিতে লাগিলেন। সেই বিদ্যালোচনার আধিক্যহেতু, চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। তাহাতেই এই মানসিক রোগের সৃষ্টি। সেই মানসিক রোগকে অবলম্বন করিয়া রজনীর প্রতি সেই বিলুপ্তপ্রায় অনুরাগ পুনঃপ্রস্ফুটিত হইল। এখন আর শচীন্দ্রের সে-মানসিক শক্তি ছিল না যে, তদ্দ্বারা তিনি সেই অবিহিত অনুরাগকে প্রশমিত করেন। বিশেষ, পূর্বেই বলিয়াছি যে, এইসকল মানসিক পীড়ার কারণ যে-যে গুপ্ত মানসিক ভাব বিকশিত হয়, তাহা অপ্রকৃত হইয়া উঠে। তখন তাহা বিকারের স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। শচীন্দ্রের সেইরূপ এ বিকার।'

আমি তখন কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, 'ইহার প্রতিকারের কী উপায় হইবে?'

সন্ন্যাসী বলিলেন, 'আমি ডাক্তারি শাস্ত্রের কিছুই জানি না। ডাক্তারদিগের দ্বারা এ রোগ উপশম হইতে পারে কি না, তাহা বিশেষ বলিতে পারি না। কিন্তু ডাক্তারেরা কখনো এ-সকল রোগের প্রতিকার করিয়াছেন, এমন আমি শুনি নাই।'

আমি বলিলাম যে, 'অনেক ডাক্তার দেখানো হইয়াছে, কোনো উপকার হয় নাই।'

স। সচরাচর বৈদ্যচিকিৎসকের দ্বারাও কোনো উপকার হইবে না।

আমি। তবে কি কোনো উপায় নাই?

স। যদি বলো, তবে আমি ঔষধ দিই।

আমি। আপনার ঔষধের অপেক্ষা কাহার ঔষধ? আপনিই আমাদের রক্ষাকর্তা। আপনিই ঔষধ দিন।

স। তুমি বাড়ির গৃহিণী। তুমি বলিলেই ঔষধ দিতে পারি। শচীন্দ্রও তোমার বাধ্য। তুমি বলিলেই আমার ঔষধ সেবন করিবে। কিন্তু কেবল ঔষধে আরোগ্য হইবে না। মানসিক পীড়ার মানসিক চিকিৎসা চাই। রজনীকে চাই।

আমি। রজনী আসিবে। ডাকিয়া পাঠাইয়াছি।

স। কিন্তু রজনীর আগমনে ভালো হইবে, কি মন্দ হইবে, তাহাও বিবেচ্য। এমত হইতে পারে যে, রজনীর প্রতি এই অপ্রকৃত অনুরাগ, রুগ্ণাবস্থায় দেখাসাক্ষাৎ হইলে বদ্ধমূল হইয়া স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইবে। যদি রজনীর সঙ্গে বিবাহ না হয়, তবে রজনীর না-আসাই ভালো।

আমি। রজনীর আসা ভালো হউক, মন্দ হউক, তাহা বিচার করিবার আর সময় নাই। ঐ দেখুন, রজনী আসিতেছে।

সেই সময়ে একজন পরিচারিকার সঙ্গে রজনী আসিয়া উপস্থিত হইল। অমরনাথও শচীন্দ্রের পীড়া শুনিয়া স্বয়ং শচীন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। এবং রজনীকে সঙ্গে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। আপনি বহির্বাটীতে থাকিয়া, পরিচারিকার সঙ্গে তাহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

পঞ্চম খণ্ড

অমরনাথের কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই অন্ধ পুষ্পনারী কী মোহিনী জানে, তাহা বলিতে পারি না। চক্ষে কটাক্ষ নাই, অথচ আমার মতো সন্ন্যাসীকেও মোহিত করিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, লবঙ্গলতার পর আর কখনো কাহাকে ভালোবাসিব না। মনুষ্যের সকলই অনর্থক দম্ভ! অন্য দূরে থাক, সহজেই এই অন্ধ পুষ্পনারী কর্তৃক মোহিত হইলাম।

মনে করিয়াছিলাম—এ জীবন অমাবস্যার রাত্রির স্বরূপ—অন্ধকারেই কাটিবে—সহসা চন্দ্রোদয় হইল! মনে করিয়াছিলাম—এ জীবনসিন্ধু সাঁতারিয়াই আমাকে পার হইতে হইবে—সহসা সম্মুখে সুবর্ণসেতু দেখিলাম। মনে করিয়াছিলাম, এ মরুভূমি চিরকাল এমনই দগ্ধক্ষেত্র থাকিবে, রজনী সহসা সেখানে নন্দনকানন আনিয়া বসাইল! আমার এ সুখের আর সীমা নাই। চিরকাল যে অন্ধকার গুহামধ্যে বাস করিয়াছে, সহসা সে যদি এই সূর্যকিরণসমুজ্জল তরুপল্লবকুসুমসুশোভিত মনুষ্যলোকে স্থাপিত হয়, তাহার যে-আনন্দ, আমার সেই আনন্দ! যে চিরকাল পরাধীন পরপীড়িত দাসানুদাস ছিল, সে যদি হঠাৎ সর্বেশ্বর সার্বভৌম হয়, তাহার যে-আনন্দ, আমার সেই আনন্দ! রজনীর মতো যে জন্মান্ধ, হঠাৎ তাহার চক্ষু ফুটিলে যে-আনন্দ, রজনীকে ভালোবাসিয়া আমার সেই আনন্দ!

কিন্তু এ আনন্দে পরিণামে কী হইবে, তাহা বলিতে পারি না। আমি চোর! আমার পিঠে, আগুনের অক্ষরে লেখা আছে যে, আমি চোর! যেদিন রজনী সেই অক্ষরে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, এ কিসের দাগ—আমি তাহাকে কী বলিব! বলিব কি যে, ও কিছু নহে? সে অন্ধ, কিছু জানিতে পারিবে না। কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমি সংসারে সুখী হইতে চাহিতেছি—তাহাকে আবার প্রতারণা করিব! যে পারে, সে করুক, আমি যখন পারিয়াছি, তখন ইহার অপেক্ষাও গুরুতর দুষ্কার্য করিয়াছি—করিয়া ফলভোগ করিয়াছি—আর কেন? আমি লবঙ্গলতার কাছে বলিয়াছিলাম, সকল কথা রজনীকে বলিব, কিন্তু বলিতে মুখ ফুটে নাই। এখন বলিব।

যেদিন রজনী শচীন্দ্রকে দেখিয়া আসিয়াছিল, সেইদিন অপরাহ্ণে আমি রজনীকে এই কথা বলিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম যে, রজনী একা বসিয়া কাঁদিতেছে। আমি তখন তাহাকে কিছু না-বলিয়া রজনীর মাসিকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রজনী কাঁদিতেছে কেন? তাহার মাসি বলিল যে, কী জানি? মিত্রদিগের বাড়ি হইতে আসিয়া অবধি রজনী কাঁদিতেছে। আমি স্বয়ং শচীন্দ্রের নিকট যাই নাই—আমার প্রতি শচীন্দ্র বিরক্ত, যদি আমাকে দেখিয়া তাহার পীড়াবৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় যাই নাই—সুতরাং সেখানে কী হইয়াছিল, তাহা জানিতাম না। রজনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন কাঁদিতেছ?' রজনী চক্ষু মুছিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আমি বড় কাতর হইলাম। বলিলাম, 'দেখ রজনি, তোমার যাহা কিছু দুঃখ তাহা জানিতে পারিলে আমি প্রাণপাত করিয়া তাহা নিবারণ করিব—তুমি কী দুঃখে কাঁদিতেছ, আমায় বলিবে না?'

রজনী আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। বহু কষ্টে আবার রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল, 'আপনি এত অনুগ্রহ করেন, কিন্তু আমি তাহার যোগ্য নহি।'

আমি। সে কী রজনি? আমি মনে জানি, আমি তোমার যোগ্য নহি। আমি তোমাকে সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।

রজনী। আমি আপনার অনুগৃহীত দাসী, আমাকে অমন কথা কেন বলেন?

আমি। শুন রজনী। আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া ইহজন্মে সুখে কাটাইব, এই আমার একান্ত ভরসা। এ আশা আমার ভগ্ন হইলে, বুঝি আমি মরিব। কিন্তু সে আশাতেও যে বিঘ্ন তাহা তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। শুনিয়া উত্তর দিও, না-শুনিয়া উত্তর দিও না। প্রথমযৌবনে একদিন আমি রূপান্ধ হইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলাম—জ্ঞান হারাইয়া চোরের কাজ করিয়াছিলাম। অঙ্গে আজিও তাহার চিহ্ন আছে। সেই কথাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি।

তখন ধীরে ধীরে, নিতান্ত ধৈর্যমাত্র সহায় করিয়া, সেই অকথনীয় কথা রজনীকে বলিলাম। রজনী অন্ধ, তাই বলিতে পারিলাম। চক্ষে চক্ষে সন্দর্শন হইলে বলিতে পারিতাম না।

রজনী নীরব হইয়া রহিল। আমি তখন বলিলাম, 'রজনি! রূপোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া প্রথমযৌবনে একদিন এই অজ্ঞানের কার্য করিয়াছিলাম। আর কখনো কোনো অপরাধ করি নাই। চিরজীবন সেই একদিনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি। আমাকে কি তুমি গ্রহণ করিবে?'

রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আপনি যদি চিরকাল দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকেন—আপনি যদি সহস্র ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও আপনি আমার কাছে দেবতা। আপনি আমাকে চরণে স্থান দিলেই আমি আপনার দাসী হইব। কিন্তু আমি আপনার যোগ্য নহি। সেই কথাটি আপনার শুনিতে বাকি আছে।'

আমি। সে কী রজনি?

রজনী। আমার এই পাপ মন পরের কাছে বিক্রীত।

আমি চমকিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সে কী রজনি?'

রজনী বলিল, 'আমি স্ত্রীলোক—আপনার কাছে ইহার অধিক আর কী প্রকারে বলিব? কিন্তু লবঙ্গ ঠাকুরানী সকল জানেন। যদি আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে সকল শুনিতে পাইবেন। বলিবেন, আমি সকল কথা বলিতে বলিয়াছি।'

আমি তখনই মিত্রদিগের গৃহে গেলাম। যে-প্রকারে লবঙ্গের সাক্ষাৎ পাইলাম, তাহা লিখিয়া ক্ষুদ্র বিষয়ে কালক্ষেপ করিব না। দেখিলাম, লবঙ্গলতা ধূলাবলুণ্ঠিতা হইয়া শচীন্দ্রের জন্য কাঁদিতেছে। যাইবামাত্র লবঙ্গলতা আমার পা জড়াইয়া আরও কাঁদিতে লাগিল—বলিল, 'ক্ষমা কর! অমরনাথ, ক্ষমা কর! তোমার উপর আমি এত অত্যাচার করিয়াছিলাম বলিয়া বিধাতা আমাকে দণ্ডিত করিতেছেন। আমার গর্ভজ পুত্রের অধিক প্রিয় পুত্র শচীন্দ্র বুঝি আমারই দোষে প্রাণ হারায়! আমি বিষ খাইব, মরিব! আজি তোমার সম্মুখে বিষ খাইয়া মরিব।'

আমার বুক ভাঙিয়া গেল। রজনী কাঁদিতেছে, লবঙ্গ কাঁদিতেছে। ইহারা স্ত্রীলোক, চক্ষের জল ফেলে; আমার চক্ষের জল পড়িতেছিল না—কিন্তু রজনীর কথায় আমার হৃদয়ের ভিতর হইতে রোদনধ্বনি উঠিতেছিল। লবঙ্গ কাঁদিতেছে, রজনী কাঁদিতেছে, আমি কাঁদিতেছি—আর শচীন্দ্রের এই দশা! কে বলে সংসার সুখের? সংসার অন্ধকার!

আপনার দুঃখ রাখিয়া আগে লবঙ্গের দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। লবঙ্গ তখন কাঁদিতে কাঁদিতে শচীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত সমুদয় বলিল। সন্ন্যাসীর বিদ্যাপরীক্ষা হইতে রুগ্‌ণশয্যায় রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত লবঙ্গ সকল বলিল।

তারপর রজনীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, 'রজনী সকল কথা বলিতে বলিয়াছে—বলো।' লবঙ্গ তখন, রজনীর কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছিল, অকপটে সকল বলিল।

রজনী শচীন্দ্রের, শচীন্দ্র রজনীর; মাঝখানে আমি কে?

এবার বস্ত্রে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ ভবের হাট হইতে আমার দোকানপাট উঠাইতে হইল। আমার অদৃষ্টে সুখ বিধাতা লিখেন নাই—পরের সুখ কাড়িয়া লইব কেন? শচীন্দ্রের রজনী শচীন্দ্রকে দিয়া আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। এ হাট ভাঙিব, এ হৃদয়কে শাসিত করিব—যিনি সুখদুঃখের অতীত, তাঁহারই চরণে সকল সমর্পণ করিব।

প্রভো, তোমায় অনেক সন্ধান করিয়াছি, কই তুমি? দর্শনে বিজ্ঞানে তুমি

নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুমি অপ্রমেয়, এজন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই। এই স্ফুটিতোন্মুখ হৃদ্‌পদ্মই তোমার প্রমাণ—ইহাতে তুমি আরোহণ কর। আমি অন্ধ পুষ্পনারীকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমার ছায়া সেখানে স্থাপন করি।

তুমি নাই? না থাকো, তোমার নামে আমি সকল উৎসর্গ করিব। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তস্মৈ নমঃ বলিয়া এ কলঙ্কলাঞ্ছিত দেহ উৎসর্গ করিব। তুমি যাহা দিয়াছ, তুমি কি তাহা লইবে না? তুমি লইবে, নহিলে এ কলঙ্কের ভার আর কে পবিত্র করিবে?

প্রভো! আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে। এ দেহ কলঙ্কিত করাইল কে, তুমি, না আমি? আমি যে অসৎ অসার, দোষ আমার, না তোমার? আমার এ মনিহারির দোকান সাজাইল কে, তুমি, না আমি? যাহা তুমি সাজাইয়াছ, তাহা তোমাকেই দিব। আমি এ ব্যবসা আর রাখিব না।

সুখ! তোমাকে সর্বত্র খুঁজিলাম—পাইলাম না। সুখ নাই—তবে আশায় কাজ কী? যে দেশে অগ্নি নাই, সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়া কী হইবে?

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সব বিসর্জন দিব।

* * *

আমি পরদিন শচীন্দ্রকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, শচীন্দ্র অধিকতর স্থির, অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল। তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথোপকথন করিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, আমার উপর যে-বিরক্তি, শচীন্দ্রের মন হইতে তাহা যায় নাই।

পরদিন পুনরপি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। প্রত্যহই তাঁহাকে দেখিতে যাইতে লাগিলাম। শচীন্দ্রের দুর্বলতা ও ক্লিষ্টভাব কমিল না, কিন্তু ক্রমে স্থৈর্য জন্মিতে লাগিল। প্রলাপ দূর হইল। ক্রমে শচীন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইলেন।

রজনীর কথা একদিনও শচীন্দ্রের মুখে শুনি নাই। কিন্তু ইহা দেখিয়াছি যে, যেদিন হইতে রজনী আসিয়াছিল, সেইদিন হইতে তাঁহার পীড়া উপশমিত হইয়া আসিতেছিল।

একদিন, যখন আর কেহ শচীন্দ্রের কাছে ছিল না, তখন আমি ধীরে ধীরে বিনা আড়ম্বরে রজনীর কথা পাড়িলাম। ক্রমে তাহার অন্ধতার কথা পাড়িলাম, অন্ধের দুঃখের কথা বলিতে লাগিলাম, এই জগৎসংসারশোভা দর্শনে সে-যে বঞ্চিত প্রিয়জনদর্শনসুখে সে-যে আজন্মমৃত্যুপর্যন্ত বঞ্চিত- এই সকল কথা তাঁহার সাক্ষাতে বলিতে লাগিলাম। দেখিলাম, শচীন্দ্র মুখ ফিরাইলেন, তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল।

অনুরাগ বটে।

তখন বলিলাম, 'আপনি রজনীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমি সেইজন্যই একটি কথার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে চাই। রজনী এক বিধাতাকর্তৃক পীড়িতা, আবার আমাকর্তৃক আরও গুরুতর পীড়িতা হইয়াছে।'

শচীন্দ্র আমার প্রতি বিকট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন।

আমি বলিলাম, 'আপনি যদি সমুদয় মনোযোগপূর্বক শুনেন, তবেই আমি বলিতে প্রবৃত্ত হই।'

শচীন্দ্র বলিলেন, 'বলুন।'

আমি বলিলাম, 'আমি অত্যন্ত লোভী এবং স্বার্থপর। আমি তাহার চরিত্রে মোহিত হইয়া, তাহাকে বিবাহ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। সে আমার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছিল, সেইজন্য আমার অভিপ্রায়ে সম্মত হইয়াছে।'

শচীন্দ্র বলিলেন, 'মহাশয়, এ-সকল কথা আমাকে বলিতেছেন কেন?'

আমি বলিলাম, 'আমি ভাবিয়া দেখিলাম, আমি সন্ন্যাসী, আমি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াই; অন্ধ রজনী কী প্রকারে আমার সঙ্গে দেশে দেশে বেড়াইবে? আমি এখন ভাবিতেছি, অন্য কোনো ভদ্রলোক তাহাকে বিবাহ করে, তবে সুখের হয়। আমি তাহাকে অন্য পাত্রস্থ করিতে চাই। যদি কেহ আপনার সন্ধানে থাকে, সেইজন্য আপনাকে এত কথা বলিতেছি।'

শচীন্দ্র একটু বেগের সহিত বলিল, 'রজনীর পাত্রের অভাব নাই।'

আমি বুঝিলাম, রজনীর বরপাত্র কে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন আবার মিত্রদিগের আলয়ে গিয়া দেখা দিলাম। লবঙ্গলতাকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইব। এক্ষণে সম্প্রতি প্রত্যাগমন করিব না—তিনি আমার শিষ্যা, আমি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিব।

লবঙ্গলতা আমার সহিত পুনশ্চ সাক্ষাৎ করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমি কালি যাহা শচীন্দ্রকে বলিয়া গিয়াছি, তাহা শুনিয়াছ কি?'

ল। শুনিয়াছি। তুমি অদ্বিতীয়। আমাকে ক্ষমা করিও; আমি তোমার গুণ জানিতাম না।

আমি নীরব হইয়া রহিলাম। তখন অবসর পাইয়া লবঙ্গলতা জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছ কেন? তুমি নাকি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ?'

অ। যাইব।

ল। কেন?

অ। যাইব না কেন? আমাকে যাইতে বারণ করিবার তো কেহ নাই।

ল। যদি আমি বারণ করি?

অ। আমি তোমার কে যে, বারণ করিবে?

ল। তুমি আমার কে? তা তো জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—

লবঙ্গলতা আর কিছু বলিল না। আমি ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া বলিলাম, 'যদি লোকান্তর থাকে, তবে?'

লবঙ্গলতা বলিল, 'আমি স্ত্রীলোক—সহজে দুর্বলা। আমার কত বল, দেখিয়া তোমার কী হইবে? আমি ইহাই বলিতে পারি, আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।'

আমি বড় বিচলিত হইলাম, বলিলাম, 'আমি সে-কথায় বিশ্বাস করি। কিন্তু একটি কথা আমি কখনো বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যদি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তবে আমার গায়ে চিরদিনের জন্য এ কলঙ্ক লিখিয়া দিলে কেন? এ যে মুছিলে যায় না—কখনো মুছিলে যাইবে না।'

লবঙ্গ অধোবদন রহিল। ক্ষণেক ভাবিল। বলিল, 'তুমি কুকাজ করিয়াছিলে, আমিও বালিকাবুদ্ধিতেই কুকাজ করিয়াছিলাম। যাহার যে দণ্ড, বিধাতা তাহার বিচার করিবেন—আমি বিচারের কে? এখন সে অনুতাপ আমার—কিন্তু সে-সকল কথা না-বলাই ভালো। তুমি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবে?'

আমি। তুমি না-বলিতেই আমি ক্ষমা করিয়াছি। ক্ষমাই বা কী? উচিত দণ্ড করিয়াছিলে—তোমার অপরাধ নাই। আমি আর আসিব না—আর কখনো তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু যদি তুমি কখনো ইহার পরে শোনো যে, অমরনাথ কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু—অণুমাত্র—স্নেহ করিবে?

ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্মে পতিত হইব।

আমি। না, আমি সে স্নেহের ভিখারি আর নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য এতটুকু স্থান নাই?

ল। না—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখি পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখনো হইবে না।

আবার 'ইহলোক'। যাক—আমি লবঙ্গের কথা বুঝিলাম কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু লবঙ্গ আমার কথা বুঝিল না। কিন্তু দেখিলাম, লবঙ্গ ঈষৎ কাঁদিতেছে।

আমি বলিলাম, 'আমার যাহা বলিবার অবশিষ্ট আছে, তাহা বলিয়া যাই। আমার কিছু ভূসম্পত্তি আছে, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। তাহা আমি দান করিয়া যাইতেছি।'

ল। কাহাকে?

আমি। যে রজনীকে বিবাহ করিবে, তাহাকে।

ল। তোমার সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি?

আমি। হাঁ। তুমি এই দানপত্র এক্ষণে তোমার কাছে অতি গোপনে রাখিবে। যতদিন না রজনীর বিবাহ হয়, ততদিন ইহার কথা প্রকাশ করিও না। বিবাহ হইয়া গেলে, রজনীর স্বামীকে দানপত্র দিও।

এই কথা বলিয়া, ললিতলবঙ্গলতার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, দানপত্র আমি তাহার নিকট ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলাম। আমি সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম—আমি আর বাড়ি গেলাম না। একেবারে স্টেশনে গিয়া বাষ্পীয় শকটারোহণে কাশ্মীর যাত্রা করিলাম।

দোকানপাট উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইহার দুই বৎসর পরে, একদা ভ্রমণ করিতে করিতে আমি ভবানীনগর গেলাম। শুনিলাম যে, মিত্রবংশীয় কেহ তথায় আসিয়া বাস করিতেছেন। কৌতূহলপ্রযুক্ত আমি দেখিতে গেলাম। দ্বারদেশে শচীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

শচীন্দ্র আমাকে চিনিতে পারিয়া, নমস্কার আলিঙ্গনপূর্বক আমার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া উত্তমাসনে বসাইলেন। অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন হইল। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, তিনি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু রজনী ফুলওয়ালী ছিল, পাছে কলিকাতায় ইহাতে লোকে ঘৃণা করে, এই ভাবিয়া তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভবানীনগরে বাস করিতেছেন। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন।

আমার নিজসম্পত্তি প্রতিগ্রহণ করিবার জন্য শচীন্দ্র বিস্তর অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম না। শেষে শচীন্দ্র রজনীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমারও সে ইচ্ছা ছিল। শচীন্দ্র আমাকে অন্তঃপুরে রজনীর নিকটে লইয়া গেলেন।

রজনীর নিকট গেলে, সে আমাকে প্রণামপূর্বক পদধূলি গ্রহণ করিল। আমি দেখিলাম যে ধূলিগ্রহণকালে, পাদস্পর্শ জন্য, অন্ধগণের স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী সে ইতস্তত হস্তসঞ্চালন করিল না, এককালেই আমার পাদস্পর্শ করিল। কিছু বিস্মিত হইলাম।

সে আমাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মুখ অবনত করিয়া রহিল। আমার বিস্ময় বাড়িল। অন্ধদিগের লজ্জা চক্ষুর্গত নহে। চক্ষে চক্ষে মিলনজনিত যে লজ্জা, তাহা তাহাদিগের ঘটিতে পারে না বলিয়া, তাহারা দৃষ্টি লুকাইবার জন্য মুখ নত করে না। একটা কী কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, রজনী মুখ তুলিয়া আবার নত করিল, দেখিলাম—নিশ্চিত দেখিলাম—সে চক্ষে কটাক্ষ!

জন্মান্ধ রজনী কি এখন তবে দেখিতে পায়? আমি শচীন্দ্রকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, এমত সময়ে শচীন্দ্র আমাকে বসিবার আসন দিবার জন্য রজনীকে আজ্ঞা করিলেন। রজনী একখানা কার্পেট লইয়া পাতিতেছিল—যেখানে পাতিতেছিল, সেখানে অল্প একবিন্দু জল পড়িয়াছিল; রজনী আসন রাখিয়া অগ্রে অঞ্চলের দ্বারা জল মুছিয়া লইয়া আসন পাতিল। আমি বিলক্ষণ দেখিলাম যে, রজনী সেই জল স্পর্শ না করিয়াই আসন পাতা বন্ধ করিয়া জল মুছিয়া লইয়াছিল। অতএব স্পর্শের দ্বারা কখনই সে জানিতে পারে নাই যে, সেখানে জল আছে। অবশ্য সে জল দেখিতে পাইয়াছিল।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রজনী এখন তুমি কি দেখিতে পাও?'

রজনী মুখ নত করিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'হাঁ।'

আমি বিস্মিত হইয়া শচীন্দ্রের মুখপানে চাহিলাম। শচীন্দ্র বলিলেন, 'আশ্চর্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় না হইতে পারে, এমন কী আছে?' আমাদিগের ভারতবর্ষে চিকিৎসাসম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য প্রকরণ ছিল—সে-সকল তত্ত্ব ইউরোপীয়েরা বহুকাল পরিশ্রম করিলেও আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। চিকিৎসাবিদ্যায় কেন, সকল বিদ্যাতেই এইরূপ। কিন্তু সে-সকল এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কেবল দুই-একজন সন্ন্যাসী উদাসীন প্রভৃতির কাছে সে-সকল লুপ্তবিদ্যার কিয়দংশ অতিগুহ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদিগের বাড়িতে একজন সন্ন্যাসী কখনো কখনো যাতায়াত করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে ভালোবাসিতেন। তিনি যখন শুনিলেন, আমি রজনীকে বিবাহ করিব, তখন বলিলেন, 'শুভদৃষ্টি হইবে কী প্রকারে? কন্যা যে অন্ধ।' আমি রহস্য করিয়া বলিলাম, 'আপনি অন্ধত্ব আরোগ্য করুন।' তিনি বলিলেন, 'করিব—এক মাসে।' ঔষধ দিয়া, তিনি এক মাসে রজনীর চক্ষে দৃষ্টি সৃজন করিলেন।'

আমি আরও বিস্মিত হইলাম; বলিলাম, 'না দেখিলে, আমি ইহা বিশ্বাস করিতাম না। ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে ইহা অসাধ্য।'

এই কথা হইতেছিল, এমত সময়ে এক বৎসরের একটি শিশু টলিতে টলিতে, চলিতে চলিতে, পড়িতে পড়িতে, উঠিতে উঠিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশু আসিয়া, রজনীর পায়ের কাছে দুই-একটা আছাড় খাইয়া, তাহার বস্ত্রের একাংশ ধৃত করিয়া টানাটানি করিয়া উঠিয়া, রজনীর হাঁটু ধরিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া, উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিল। তাহার পরে, ক্ষণেক আমার মুখপানে চাহিয়া হস্তোত্তোলন করিয়া আমাকে বলিল, 'দা!' (যা!)

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে এটি?'

শচীন্দ্র বলিলেন, 'আমার ছেলে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইহার নাম কী রাখিয়াছেন?'

শচীন্দ্র বলিলেন, 'অমরপ্রসাদ।'

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না।

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি '**চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা**'র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

 বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র